তাওযীহু উছূলিল ফিক্বহ

আলা মানাহিজি আহলিল হাদীছ

যাকারীয়া ইবনে গুলাম ক্বাদীর

توضيح أصول الفقه

على منهج أهل الحديث

তাওযীহু উছূলিল ফিক্বহ

আলা মানাহিজি আহলিল হাদীছ

প্রধান অফিস
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ -ব্যক্তিগত)
www.maktabatussunnah.org
maktabatussunnah19@gmail.com

শাখা অফিস
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২২ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা

توضيح أصول الفقه

على منهج أهل الحديث

তাওদ্বীহু উছূলিল ফিক্বহ

‘আলা মানাহিজি আহলিল হাদীছ

[আহলুল হাদীছ মানহাজের ভিত্তিতে ফিক্বহের মূলনীতির ব্যাখ্যা]

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

লেখক: যাকারীয়া ইবনে গুলাম ক্বাদীর পাকিস্থানী

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আনসারী

দাওরাতুল হাদীছ, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

الناشر : مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ভূমিকা.. ২৮

অধ্যায়ঃ ১

আহলুল হাদীছ একমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত দল এ বিষয়ে দলীল এবং আহলুল হাদীছদের মর্যাদা ও তাদের পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে ইমামগণের প্রশংসামূলক বাণী ৩০

অধ্যায়ঃ ২- মূলনীতি গঠনের নীতিমালা

ক্বায়দা-১: মূলনীতি দলীল বিহীন প্রমাণিত হতে পারে না, বিধায় মূলনীতি গঠনে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দলীল উপস্থাপন করতে হবে। আর এমন মূলনীতি দ্বারা দলীল উপস্থাপন করা যাবে না, যেই মূলনীতি দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি................৩৬

ক্বায়দা-২: ক্বায়দা বা মূলনীতির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন ছ্বহীহ না হলে তা মূল ক্বায়দা ছ্বহীহ না হওয়াকে আবশ্যক করে না.. ৩৭

ক্বায়দা-৩: সুন্নাহ ও জামা'আতকে আঁকড়ে ধরে রাখে এমন ক্বাওয়ায়েদ আল কুল্লীয়্যাহ বিবেচনায় রাখা ওয়াজিব..৩৮

ক্বায়দা-৪: খাছ্ব (নির্দিষ্ট) দলীল 'আম বা সাধারণ ক্বায়দার উপরে প্রাধান্য পাবে..৩৮

ক্বায়দা-৫: কোনো কোনো শাখাগত মাসআলায় আলেমগণের মতানৈক্য হওয়া, মৌলিক ক্বায়দার মধ্যে মতানৈক্য হওয়া নয়..৩৯

ক্বায়দা-৬: উছূলুল ফিক্বহ শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় এমন যেকোনো ক্বায়দার আলোকে যদি কোনো শাখাগত ফিক্বহী মাসআলা উদ্ভাবন না করা হয় অথবা যে ক্বায়দার মধ্যে মতানৈক্য হওয়ার দ্বারা কোনো শাখাগত ফিক্বহী মাসআলায় মতানৈক্য হয় না তাহলে আলোচিত এমন যেকোনো ক্বায়দা উছূলুল ফিক্বহ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়..৩৯

অধ্যায়: ৩-আহলুল হাদীছদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নীতিমালা।

ক্বায়দা-১: আহলুল হাদীছ এর মূলনীতিসমূহ অন্যদের মূলনীতির চেয়ে অধিক ছ্বহীহ। আর তাদের ত্বরীক্বা অন্যদের ত্বরীক্বার চেয়ে অধিক ছ্বহীহ.................. ৪৫

ক্বায়দা-২: "সালাফ আছ্ব-ছ্বলেহীন এর উপলব্ধির আলোকে আল্লাহর কিতাব ও ছ্বহীহ হাদীছের অনুসরণ করা" আহলুল হাদীছ এই সাধারণ মূলনীতির আলোকে পথ চলে..................৪৬

ক্বায়দা-৩: নিজেকে আহলুল হাদীছের দিকে সম্বন্ধ করে এমন কেউ তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাদের পথে চলে..................৪৭

ক্বায়দা-৪: আহলুল হাদীছের মানহাজ (কর্মপদ্ধতি) মৌলিক ক্বায়দা ও মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল, মাসায়েলের উপর নয়..................৪৮

ক্বায়দা-৫: যে একটি ক্বায়দাতেও আহলুল হাদীছের সঙ্গে মতানৈক্য পোষণ করে, সে আহলুল হাদীছের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত নয়..................৪৮

ক্বায়দা-৬: যারা আহলুল হাদীছের মতের বিরোধিতা করে তাদের সঙ্গে আহলুল হাদীছ ন্যায় ও ইনছ্বাফ বজায় রাখে..................৪৯

ক্বায়দা-৭: মতানৈক্য আহলুল হাদীছের মধ্যেও সংঘটিত হয়। কিন্তু এই মতানৈক্যের ফলে তারা বিচ্ছিন্ন হয় না..................৫০

ক্বায়দা-৮: ভুলকথা প্রত্যাখ্যানযোগ্য যদিও সেই কথার প্রবক্তা আহলুল হাদীছ হয়..................৫০

ক্বায়দা-৯: হক্ব সর্বদা আহলুল হাদীছদের মধ্যেই বিদ্যমান..................৫০

ক্বায়দা-১০: আহলুল হাদীছ দীনের সকল মাসআলার উপর আমল করে এবং সকল মাসআলাকেই শক্ত করে আঁকড়ে ধরে..................৫২

অধ্যায়: ৪-দলীলের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: যেকোনো মূলনীতি অথবা মাসআলা গঠনের মূলভিত্তি হলো দলীল..................৫৩

ক্বায়দা-২: শারঈ বিধি-বিধান ছ্বহীহ হাদীছ থেকে প্রণয়ন করতে হবে, দ্বয়ীফ হাদীছ থেকে নয়..................৫৪

ক্বায়দা-৩: দ্বয়ীফ হাদীছের উপর আমল করা জায়েয নেই, চাই তা ফাদ্বায়েলে আমলের ক্ষেত্রে হোক অথবা অন্যকোনো ক্ষেত্রে হোক..................৫৫

ক্বায়দা-৪: দলীল সেভাবেই বুঝতে হবে যেভাবে সালাফে ছ্বলিহীন বুঝেছেন..৫৯

ক্বায়দা-৫: কোনোরূপ ব্যাখ্যা ছাড়াই দলীলের বাহ্যিক অর্থ মেনে নেওয়া ওয়াজিব..৬৩

ক্বায়দা-৬: জমহূর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) আলেমের মতামতের ভিত্তিতে দলীলের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করা যাবে না..৬৯

ক্বায়দা-৭: শুধুমাত্র সম্ভাবনার কারণে দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মত বাত্বিল হয় না..৬৯

ক্বায়দা-৮: সকল ক্বায়দা ও বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মুতাওয়াতির দলীল ও খবরে ওয়াহিদ দলীল এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই.......................................৭০

ক্বায়দা-৯: দলীলের উপরেই আমল করা ওয়াজিব, যদিও জানা না যায় কেউ আমল করেছে কি না...৭৩

ক্বায়দা-১০: দলীল অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব যদিও কোনো সালাফদের কেউ (আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হোন) সেই দলীলের বিরোধিতা করে থাকে..৭৭

ক্বায়দা-১১: দলীল পরিত্যাগ করা বৈধ নয় যদিও মানুষ সেই দলীলের বিপরীত আমল করে..৭৮

ক্বায়দা-১২: দলীল কখনো বিবেক-বুদ্ধির সাংঘর্ষিক হয় না, বরং বিবেক-বুদ্ধি দলীলের উপর কোনো অভিযোগ না করেই দলীলকে স্বীকার করবে..................৭৯

ক্বায়দা-১৩: যেই বিধানগুলো দলীলের মধ্যে সাধারণভাবে কোনো শর্ত ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে সেই বিধানগুলোকে সীমাবদ্ধ করা যাবে না..............................৮০

ক্বায়দা-১৪: দলীলে উদ্ধৃত বিষয়ের সঙ্গে এমন বিষয় সংযুক্ত করা যাবে না যা দলীলে উদ্ধৃত হয়নি..৮১

ক্বায়দা-১৫: যে বিষয়ে স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান সে বিষয়ে কোনো সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই...৮২

ক্বায়দা-১৬: কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা না করে ভারসাম্যপূর্ণতার সঙ্গে দলীলের ব্যাখ্যা করা ও তা বোঝা ওয়াজিব...৮৩

ক্বায়দা-১৭: কোনো ঘটনায় বর্ণিত বিধান কেবল ঘটনার চরিত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়। বরং উক্ত ঘটনায় বর্ণিত ঐ বিধানটি দ্বারা উক্ত ঘটনার চরিত্র ছাড়াও অন্য ক্ষেত্রেও দলীল হিসাবে পেশ করা যাবে...৮৪

ক্বায়দা-১৮: একই বিষয়ে বর্ণিত সকল দলীল গ্রহণ করা ওয়াজিব। কোনো দলীল ছেড়ে দেওয়া যাবে না, বরং প্রতিটি দলীলকেই যথাযথ স্থানে ব্যবহার করতে হবে। আর যেই দলীলটি বিষয়ের মূল দলীল, সেই দলীলের আলোকে সকল দলীলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হবে..৮৫

ক্বায়দা-১৯: একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বা একটি হাদীছ এর সমার্থক সকল ছহীহ বর্ণনাগুলো গ্রহণ করা ওয়াজিব..৮৬

ক্বায়দা-২০: দলীল দ্বারা কোনো বিষয় সাব্যস্ত করা পূর্ণতায় পৌঁছবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দলীলের বাচনভঙ্গি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ না করা হবে এবং দলীলের প্রাসঙ্গিক অবস্থায় দৃষ্টিপাত না করা হবে..৮৮

ক্বায়দা-২১: সুন্নাহ একটি অপরটির ব্যাখ্যা করে। আর স্পষ্ট বর্ণনা একাধিক সম্ভাবনাময় বর্ণনাকে স্পষ্ট করে..৯০

ক্বায়দা-২২: দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে দলীলটি দাবির অর্থের প্রতি নির্দেশক হওয়া ওয়াজিব..৯১

ক্বায়দা-২৩: যেই বিষয়ে মানুষের প্রয়োজন অনেক ব্যাপক, যদি সেই বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট দলীল না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে বিষয়টি বৈধ......................৯১

অধ্যায়: ৫-ইজমা’ সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: ইজমা’ অন্যতম একটি শারঈ দলীল...৯৩

ক্বায়দা-২: ইজমা’ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অবশ্যই কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে..৯৪

ক্বায়দা-৩: ইজমা’কে কিতাব ও সুন্নাহ এর উপরে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না..৯৬

ক্বায়দা-৪: ইজমা’ নছ্ককে (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) রহিত করে না.....................৯৭

ক্বায়দা-৫: যেই বিষয়ের ইজমা’ সংঘটিত হওয়ার ধারণা প্রাধান্য লাভ করে সেই ইজমা’ দীনের অপরিহার্য অংশে হয়ে থাকে..৯৮

ক্বায়দা-৬: ছাহাবাগণের ইজমা’ সংঘটিত হওয়া সম্ভব তবে তাদের পরবর্তীদের ইজমা’ সংঘটিত হওয়া দুঃসাধ্য..৯৯

ক্বায়দা-৭: যখন দুইজন আলেম কোনো মাসআলায় ইজমা’ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করে তখন মতানৈক্য বর্ণনাকারীর বক্তব্যকেই ঐ মাসআলায় প্রাধান্য দেওয়া হবে যেহেতু তার দাবি হাঁ-সূচক..................................১০০

ক্বায়দা-৮: মতানৈক্যকারী সম্পর্কে না জানার কারণে ইজমা' এর দাবি ছ্বহীহ হবে না......১০১

ক্বায়দা-৯: মদীনাবাসীর ইজমা' প্রমাণযোগ্য দলীল নয়......১০১

ক্বায়দা-১০: কোনো মাসআলায় জমহূর (অধিকাংশ) আলেমের বক্তব্য দলীলযোগ্য প্রমাণ নয়......১০৩

ক্বায়দা-১১: কোনো মাসআলায় সর্বনিম্ন অবস্থানকে ইজমা' এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলা যায় না......১০৪

ক্বায়দা-১২: কোনো মাসআলায় বিস্তারিত বিশ্লেষণ উদ্ভাবন করা নিষিদ্ধ যখন সেই বিশ্লেষণ ইজমা' এর দাবিকে ভঙ্গ করে......১০৫

ক্বায়দা-১৩: ইজমা' এর ক্ষেত্রে যাহিরী মাযহাবের মতানৈক্য ধর্তব্য হবে......১০৫

অধ্যায়: ৬-ক্বিয়াস সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: ক্বিয়াস অন্যতম একটি শারঈ দলীল......১০৬

ক্বায়দা-২: নছ্বের বিপরীতে কোনো ক্বিয়াস গ্রহণযোগ্য হবে না......১০৭

ক্বায়দা-৩: একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ক্বিয়াসের দিকে যাওয়া যাবে না......১০৮

ক্বায়দা-৪: সাধারণ মূলনীতির বিপরীতে সাব্যস্ত হয়েছে এমন নছ্বের উপরে ভিত্তি করেও ক্বিয়াস করা ছ্বহীহ......১১০

ক্বায়দা-৫: ছ্বহীহ ক্বিয়াস দুর্বল হাদীছের উপরে অগ্রাধিকার পাবে......১১১

ক্বায়দা-৬: ছাহাবীর বক্তব্য ক্বিয়াসের উপরে অগ্রাধিকার পাবে যদি অন্যকোনো ছাহাবী সেই বক্তব্যের বিরোধিতা না করে......১১২

ক্বায়দা-৭: অস্তিত্বহীন হওয়া না হওয়ার দিক থেকে বিধান তার উপযুক্ত কারণ এর সঙ্গে আবর্তিত হয়......১১৩

ক্বায়দা-৮: কারণ একমাত্র দলীল দ্বারাই সাব্যস্ত হতে পারে......১১৪

ক্বায়দা-৯: যদি কারণ বিলুপ্ত হওয়ার পরেও বিধান অস্তিত্বশীল থাকে তাহলে এই বিষয়টি উক্ত কারণ এর অকার্যকারিতার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। কারণ বিধানটি কারণ ছাড়াই সাব্যস্ত হয়েছে......১১৮

ক্বায়দা-১০: বিধানের পরে কোনো বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেওয়াটা উক্ত বৈশিষ্ট্যটি কারণ হওয়ার দলীল......১১৮

ক্বায়দা-১১: শুধুমাত্র গাঠনিক সাদৃশ্যকে কারণ ধার্য করা ছ্বহীহ নয়..................১১৯

ক্বায়দা-১২: ইবাদতে কোনো ক্বিয়াস নেই..১১৯

অধ্যায়ঃ ৭

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কার্যাবলি সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: নির্দিষ্টতা দলীল ছাড়া সাব্যস্ত হয় না..১২১

ক্বায়দা-২: যেই ইবাদত নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত করেননি সেই ইবাদত নিয়মিত করা শরী'আত সম্মত নয়..১২২

ক্বায়দা-৩: যেই কর্ম নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নির্দিষ্ট কারণকে ভিত্তি করে করেছেন সেই কর্মকে স্থায়ী সুন্নাহরূপে গ্রহণ করা যাবে না। বরং সেই কর্মটি শুধু তখন করা যাবে যখন উক্ত কারণটি পাওয়া যাবে..................১২৩

ক্বায়দা-৪: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৌন সম্মতি প্রমাণযোগ্য দলীল..১২৪

ক্বায়দা-৫: যা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ঘটেছে তা প্রমাণযোগ্য দলীলরূপে বিবেচিত হবে যদিও নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বিষয়ে অবগত হননি..১২৫

ক্বায়দা-৬: শুধু নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্ম দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না..১২৬

ক্বায়দা-৭: যেই বস্তুর প্রকৃত অবস্থা বৈধ সেই বস্তুটি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পরিত্যাগ করাটা আমাদের জন্য পরিত্যাগ করা ওয়াজিব হওয়া নির্দেশ করে না..১২৮

ক্বায়দা-৮: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করতে চেয়েছেন কিন্তু করেননি তা প্রকৃত পক্ষে প্রমাণ হতে পারে না..১২৯

ক্বায়দা-৯: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত শুধুমাত্র স্বভাবজাত কর্ম বাস্তবায়ন করার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকটে কোনো নেকীর আশা করতে পারবে না..১৩০

ক্বায়দা-১০: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসকল স্বভাবজাত কর্মকে পছন্দ করেছেন সেগুলোকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসায় মুস্তাহাব মেনে নিতে হবে..১৩৬

ক্বায়দা-১১: যেসকল কর্ম নির্দিষ্ট পন্থায় ক্রমাগতভাবে করার ফলে স্বভাবজাত অবস্থা থেকে বের হয়ে শরী'আহ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে সেই কর্মসমূহে তাঁর অনুকরণ করা মুস্তাহাব..........১৩৭

ক্বায়দা-১২: একই ইবাদত যদি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে করে থাকেন, যদিও তা একত্রে করা সম্ভব ছিল। তাই সংশ্লিষ্ট ইবাদতটির সকল ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি একত্রে সম্পন্ন করা যাবে না..........১৩৮

ক্বায়দা-১৩: নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্ম দ্বারা সকল প্রকার ব্যাখ্যা সাব্যস্ত হবে..........১৪০

ক্বায়দা-১৪: কোনো কর্ম সম্পাদনে বাধা নেই বরং উক্ত কর্মের চাহিদা বিদ্যমান আছে এরপরেও যদি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত কর্ম পরিত্যাগ করেন, তাহলে বুঝতে হবে উক্ত কর্মটি পরিত্যাগ করাই সুন্নাহ আর সম্পাদন করা বিদ'আত..........১৪০

ক্বায়দা-১৫: নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্মসমূহের মাঝে কোনো সংঘর্ষ নেই..........১৪২

ক্বায়দা-১৬: যখন কর্মের সাথে কথার সংঘর্ষ সাব্যস্ত হবে কিন্তু উভয়টির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হবে না তখন কথা কর্মের উপরে প্রাধান্য পাবে..........১৪৩

ক্বায়দা-১৭: যেই কর্মটি (كان) ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত হয়ে আসবে সেই কর্মের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো কর্মটি বারংবার সংঘটিত হয়েছে..........১৪৫

অধ্যায়: ৮-সালাফদের আছার সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: যেই বিষয়ে কোনো নছ নেই সেই বিষয়ে ছাহাবীর বক্তব্য প্রমাণযোগ্য দলীল যদি অন্যকোনো ছাহাবী উক্ত বক্তব্যের বিরোধিতা না করে..........১৪৬

ক্বায়দা-২: ছাহাবাগণের আছার দ্বারা দলীল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শর্ত হলো আছারগুলোর সনদ ছহীহ হওয়া, তবে ছাহাবাগণের পরবর্তীদের আছারের ক্ষেত্রে সনদের বিচার-বিশ্লেষণ শর্ত নয় তবে যদি তাতে কোনো অস্পষ্ট বা দুর্বোদ্ধ বিষয় থাকে..........১৫২

ক্বায়দা-৩: ছাহাবীর বক্তব্য যখন প্রসিদ্ধি লাভ করবে এবং কেউ (কোনো ছাহাবী) তার বক্তব্যের বিরোধিতা না করবে তখন উক্ত বক্তব্যটি ইজমা' ও দলীল বলে বিবেচিত হবে..........১৫৪

ক্বায়দা-৪: যখন ছাহাবাগণের বক্তব্যের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে তখন শরী'আতের মূল উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে তাদের একজনের বক্তব্য অপরজনের বক্তব্যের উপরে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না.....................................১৫৪

ক্বায়দা-৫: যখন ছাহাবাগণ কোনো মাসআলায় দুইটি মত পোষণ করবেন, তখন খুলাফায়ে রাশিদীন এর কেউ যদি কোনো এক পক্ষে থাকে, তাহলে সেই পক্ষের মতই অপর পক্ষের মতের উপরে প্রাধান্য পাবে...১৫৫

ক্বায়দা-৬: যখন ছাহাবাগণ কোনো মাসআলায় মতানৈক্য করবেন, আর উক্ত বিষয়ে কোন দলীল ও খোলাফায়ে রাশিদীন এর কোনো একজনেরও কোনো মত থাকবে না তখন অধিকাংশ ছাহাবাগণের মতকেই গ্রহণ করা হবে.....................১৫৬

ক্বায়দা-৭: যখন কোন ছাহাবী কোনো বিষয়ে এমন মত পোষণ করেন যে মতের মধ্যে রায়ের কোনো অবকাশ থাকে না, তখন অন্য ছাহাবী সেই মতের বিরোধীতা করলেও তা প্রাধান্য পাবে...১৫৭

ক্বায়দা-৮: কোন ছাহাবী স্বীয় বর্ণনার ব্যাপারে অন্যের চেয়ে অধিক অবগত...১৫৭

ক্বায়দা-৯: যখন কোনো ছাহাবী স্বীয় বর্ণনার বিরোধিতা করবেন তখন তার বর্ণনাটি ধর্তব্য হবে তার মত গ্রহণযোগ্য হবে না...১৫৯

ক্বায়দা-১০: যখন ছাহাবীর মত কোনো মারফূ' হাদীছের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় আর উক্ত হাদীছ আর তার মতের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয় তখন উভয়টির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করাটাই অধিকতর শ্রেয়...১৬০

ক্বায়দা-১১: শব্দের অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ছাহাবাগণের ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে...১৬১

ক্বায়দা-১২: ছাহাবাগণ যেই বিষয়ে মৌন স্বীকৃতি প্রদান করেছেন এবং তা অস্বীকার করেননি অথবা যা সালাফদের যুগে প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু তারা তা অস্বীকার বা নিষেধ করেননি তাহলে এমন মৌন স্বীকৃতি সেই বিষয়টি শরী'আত সম্মত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে...১৬১

ক্বায়দা-১৩: ছাহাবীর বক্তব্য: "তারা এই এই কাজ করতেন অথবা আমরা এই কাজ করতাম" এটা বিধানগত দিক থেকে মারফূ' হাদীছের সমপর্যায়ের...........১৬২

ক্বায়দা-১৪: ছাহাবীর সূত্রে বর্ণিত কোনো কথা বা কাজ যদি এমন হয় যেখানে রায় বা যুক্তির কোনো অবকাশ নেই তাহলে সেই কাজ বা কথাটি বিধানগত দিক থেকে মারফূ' হাদীছের সমপর্যায়ের হবে, আর সেই বর্ণনাটি দলীল হিসেবে বিবেচিত হবে। আর তাবেঈর সূত্রে যা বর্ণিত হবে তা মারফূ' হাদীছের সমপর্যায়ের হবে না বিধায় তা দলীল হিসেবে বিবেচিত হবে না...১৬৩

ক্বায়দা-১৫: ছাহাবীর বক্তব্য "এই কাজ সুন্নাহ" তাহলে তা বিধানগতভাবে মারফূ' হাদীছের সমপর্যায়ের। আর তাবেঈর বক্তব্য "এই এই কাজ সুন্নাহ" তাহলে তা বিধানগতভাবে মুরসালের সমপর্যায়ের যা দলীল যোগ্য নয়........................১৬৫

ক্বায়দা-১৬: ছাহাবীর বক্তব্য: (আমাদেরকে এই কাজ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে আর এই কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে) যদি কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া (যেই ক্রিয়ার কর্তা অজানা) দ্বারা বলা হয় তাহলে এই বক্তব্যে বিদ্যমান আদেশ ও নিষেধ শরী'আত প্রণেতার পক্ষ থেকে ধার্য করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে..১৬৬

ক্বায়দা-১৭: যখন কোনো একজন সালাফদের নিকট থেকে একই মাসআলায় দুইটি মত বর্ণিত হয়, আর উক্ত মাসআলায় কোনো দলীল না থাকে তখন উভয় মতের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে, আর যদি মাসআলাটিতে দলীল বিদ্যমান থাকে তাহলে ঐ মতকেই গ্রহণ করতে হবে যা দলীলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবে..১৬৮

ক্বায়দা-১৮: সালাফদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তির সংঘটিত হওয়া কর্ম অথবা বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে সালাফদের জামা'আতের প্রতি কোনো ক্বায়দার সম্বন্ধ করা যাবে না...১৬৯

ক্বায়দা-১৯: তাবে-তাবেঈন এর ফতোয়া গ্রহণ করার চেয়ে তাবেঈন এর ফতোয়া গ্রহণ করাই অধিক উত্তম...১৬৯

ক্বায়দা-২০: সালাফদের মত যখন একই মাসআলায় ভিন্ন ভিন্ন হবে তখন উভয়টির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করাটাই অধিক শ্রেয়...১৭০

ক্বায়দা-২১: সালাফদের একটি বা দুইটি মতামত (যেকোনো বিষয়ে) এর অভিব্যক্তি সংগ্রহ করে রাখার চেয়ে তাদের মতামত এর সাথে সম্পৃক্ত সকল শব্দসমষ্টি একস্থানে সংগ্রহ করে রাখাটা মূল উদ্দেশ্যের প্রতি অধিক অর্থবহ...১৭১

ক্বায়দা-২২: সালাফদের বক্তব্য তাদের উদ্দেশ্য ও পরিভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে..১৭২

ক্বায়দা-২৩: কোনো মাসআলায় তাবেঈ এর বক্তব্য দলীল হতে পারে না..১৭৪

ক্বায়দা-২৪: যখন একই মাসআলায় কোনো ইমামের একাধিক অর্থ বিশিষ্ট বক্তব্য আসবে, আর আরেকটি স্পষ্ট অর্থবোধক বক্তব্য আসবে, তখন স্পষ্ট অর্থবোধক বক্তব্যটিই গ্রহণযোগ্য হবে। আর একাধিক অর্থ বিশিষ্ট বক্তব্যকে স্পষ্ট অর্থবোধক বক্তব্যের দিকে সমর্পিত করা হবে...১৭৪

ক্বায়দা-২৫: কোনো মাসআলায় কোনো সালাফ থেকে দুর্বল অভিমত বর্ণিত হলে তা দলীল দ্বারা খণ্ডন করা হবে......১৭৫

অধ্যায়: ৯-নাসিখ (রহিতকারী) মানসূখ (রহিতকৃত) সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: (النسخ) শব্দটির মর্ম সালাফ আর পরবর্তী যুগের আলেমদের নিকট এক নয়......১৭৬

ক্বায়দা-২: নাসখ (রহিত করা) দলীলের দ্বারা সাব্যস্ত হবে, সম্ভাব্য কোনো দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হবে না। দলীলের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো দলীল মুহকাম (স্পষ্ট) হয়ে থাকে, মানসূখ (রহিত) হয় না......১৭৭

ক্বায়দা-৩: নাসখ কখনো (ভবিষ্যত বা অতীতের) সংবাদসমূহ অথবা ক্বাওয়াঈদ আল কুল্লীয়্যা (সাধারণ ক্বাওয়াঈদ) এর মাঝে প্রবেশ করবে না......১৭৭

ক্বায়দা-৪: ক্বিয়াস দ্বারা কোনো বিধান রহিত করা জায়েয নেই......১৭৮

ক্বায়দা-৫: নাসখ এর ব্যাপারে ছাহাবীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্পর্কে......১৭৯

ক্বায়দা-৬: কোনো ছাহাবীর শেষের দিকে ইসলাম গ্রহণ করা কোনো বিধান রহিত হওয়ার দলীল হতে পারে না......১৭৯

অধ্যায়: ১০

একাধিক দলীলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা ও একটিকে অপরটির উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: সাংঘর্ষিক অর্থপূর্ণ হাদীছগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে হাদীছগুলোকে প্রত্যাখ্যান বা খণ্ডন করা যাবে না ১৮১

ক্বায়দা-২: এমন দুইটি দলীলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা যাবে না যেই দুইটির একটি দলীল হিসাবে সাব্যস্ত নয়......১৮২

ক্বায়দা-৩: দুইটি সাংঘর্ষিক দলীলের মাঝে দূরবর্তী কোনো তাবীল বা ব্যাখ্যা দ্বারা সামঞ্জস্য বিধান করা যাবে না......১৮২

ক্বায়দা-৪: সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হওয়া অবস্থায় অগ্রাধিকার এর দিকে যাওয়া যাবে না...............১৮৩

ক্বায়দা-৫: একমাত্র শরী'আত সম্মত পদ্ধতি ছাড়া আর কোনো পদ্ধতিতে তারজীহ বা অগ্রাধিকার প্রদান ছ্বহীহ হবে না...............১৮৪

ক্বায়দা-৬: যখন সমজাতীয় দুইটি সাদৃশ্যপূর্ণ প্রেক্ষাপটে দুইটি হাদীছ সাংঘর্ষিক হয় তখন উভয়টিকে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি বিধানের জন্য ধার্য করা হবে। আর প্রত্যেকটিকে তার যথাস্থানে ব্যবহার করা হবে...............১৮৫

ক্বায়দা-৭: যখন কোনো হাদীছে স্পষ্ট অর্থবোধক বিধান আসে, তখন উক্ত হাদীছের স্পষ্ট অর্থবোধক বিধানটি ভিন্ন আরেকটি হাদীছ থেকে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা বিধান এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না যেই হাদীছটি সম্পূর্ণরূপে উক্ত গবেষণাকৃত বিধানটির বর্ণনা দেওয়ার জন্য আসেনি...............১৮৬

ক্বায়দা-৮: কোনো বিধানকে সাব্যস্ত করে এমন হাদীছের রাবীর বর্ণনা ঐ রাবীর বর্ণনার উপরে প্রাধান্য পাবে যে উক্ত বিধানকে নাকচ করে দেয়...............১৮৭

অধ্যায়: ১১-আমর বা আদেশ সংক্রান্ত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: আমর বা আদেশ সাধারণত ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হয়...............১৮৮

ক্বায়দা-২: আমর বা আদিষ্ট বিধানটি তাৎক্ষণিকভাবে পালনের দাবি রাখে...............১৯১

ক্বায়দা-৩: সাধারণ আমর (আদেশ) বা আদিষ্ট বিষয়টি বারবার পালনের দাবি রাখে...............১৯১

ক্বায়দা-৪: যে বিষয়টি নির্দিষ্ট একটি পন্থায় সম্পাদনের আদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সে বিষয়টি সম্পাদন প্রক্রিয়া শুরুতেই করার কোনো আদেশ দেওয়া হয়নি, তাহলে এমন বিষয় উক্ত নির্দিষ্ট পন্থায় সম্পাদন করা ওয়াজিব হবে, কিন্তু উক্ত বিষয়টি দ্বারা শুরু করা ওয়াজিব হবে না...............১৯৪

ক্বায়দা-৫: ছাহাবীর বক্তব্য: (আমাদেরকে এই বিষয়ে আদেশ প্রদান করা হয়েছে) আদিষ্ট বিষয়টি ওয়াজিব হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে...............১৯৪

ক্বায়দা-৬: কোনো কর্ম নিষিদ্ধ করার পরে পুনরায় তা সম্পাদনের আদেশ উক্ত কর্মটি সম্পাদনের আদেশ দেওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থার বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করে...............১৯৫

ক্বায়দা-৭: আদেশসূচক খবর ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হয়.....................................১৯৬

ক্বায়দা-৮: যখন কোনো আমরকে (আদেশসূচক ক্রিয়া) ওয়াজিব এর অর্থ থেকে স্থানান্তর করা হবে তখন আমরটিকে মুস্তাহাব এর অর্থে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে, মুবাহ বা বৈধতার অর্থে নয়.....................................১৯৭

ক্বায়দা-৯: কোন ছাহাবীর আমর বা আদেশ ওয়াজিব অর্থে প্রযোজ্য নয়.....................................১৯৮

ক্বায়দা-১০: একাধিকবার সম্পাদন করার আদেশ এর সম্ভাবনা বিদ্যমান এমন আমর (আদেশসূচক ক্রিয়া) দ্বারা উদ্দেশ্য তা একবার সম্পাদন করা.....................................১৯৮

ক্বায়দা-১১: ক্বাযা আদায় করার বিধান সাব্যস্ত হয় নতুন আদেশ দ্বারা, আদায় করার মর্মে প্রদানকৃত আদেশ দ্বারা ক্বাযা সাব্যস্ত হয় না.....................................১৯৯

ক্বায়দা-১২: প্রশ্নের সাথে উত্তররূপে আসা আদেশ এর অর্থ প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য অনুসারে নির্ণয় করা হবে.....................................২০০

অধ্যায়: ১২-নাহী (নিষেধ) সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: নাহী (কোনো কর্মের প্রতি নিষেধাজ্ঞা) হারাম বা নিষিদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করে.....................................২০৩

ক্বায়দা-২: নাহী (নিষেধাজ্ঞা) ফাসাদ বা অকার্যকারিতার প্রতি ইঙ্গিত করে.....................................২০৪

ক্বায়দা-৩: কোনো প্রশ্নের সাথে উত্তররূপে আসা নিষেধাজ্ঞার অর্থ প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য অনুসারে নির্ণয় করা হবে.....................................২০৮

অধ্যায়: ১৩-‘আম (সাধারণ) ও খাছ্ব (নির্দিষ্ট) সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: খাছ্ব (নির্দিষ্ট) ‘আম (সাধারণ) এর দাবিকে নির্মূল করে দেয়.....................................২০৯

ক্বায়দা-২: ‘আম এর অন্তর্ভুক্ত কিছুকে (নছ্বের মধ্যে) নির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করার অর্থ হলো ‘আম নছ্ব এর দাবিকে (খাছ্ব নছ্ব এর মধ্যে) উল্লিখিতগুলোর সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া এটাই মূলনীতি, তবে এর বিপরীতে কোনো নির্দেশিকা বিদ্যমান থাকলে ভিন্ন কথা.....................................২১০

ক্বায়দা-৩: 'আমের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো 'আমের ব্যাপকতার দাবি অনুসারেই আমল করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমের দাবিকে নির্দিষ্টকারী কোনো খাছ্ব দলীল না পাওয়া যাবে..২১২

ক্বায়দা-৪: যদি কোনো 'আম নছ্ব এর ব্যাপকতার দাবি অনুযায়ী আমল করার বিষয়টি সালাফদের মধ্যে প্রচলিত না থাকে তাহলে সেই 'আম নছ্বের দাবি অনুসারে আমল করা শরীয়াহসম্মত নয়..২১৫

ক্বায়দা-৫: শব্দের 'আম তথা সাধারণ দাবি (আমলের ক্ষেত্রে) প্রাধান্য দেওয়া হবে নির্দিষ্ট কোনো প্রেক্ষাপট বা কোনো কারণ ধর্তব্য হবে না..২১৮

ক্বায়দা-৬: যেখানে কোনো কর্ম বাস্তবায়নের একাধিক সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় না (বরং কোনো কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে শুধুমাত্র মূল কর্মটি বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়) সেই স্থানে বর্ণিত বক্তব্যটি 'আম তথা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ধর্তব্য হবে..২১৯

ক্বায়দা-৭: বিরল দৃষ্টান্ত বিশিষ্ট সত্তা 'আম নছ্ব এর সাধারণ দাবির অন্তর্ভুক্ত..২২০

ক্বায়দা-৮: প্রত্যেক 'আমের মধ্যেই নির্দিষ্টতা থাকতে হবে এমনটা নয়..২২১

ক্বায়দা-৯: খাছ্ব তথা নির্দিষ্ট নছ্বকে সর্বক্ষেত্রে 'আম নছ্বের উপরে প্রাধান্য দেওয়া হবে চাই 'আম নছ্বটি খাছ্ব নছ্বটির পূর্বে বর্ণিত হোক অথবা পরে..২২৩

ক্বায়দা-১০: যেই 'আমের মধ্যে নির্দিষ্টতা প্রবেশ করেছে সেই 'আমের অবশিষ্টগুলোর ক্ষেত্রে 'আম এর বিধানটি প্রযোজ্য হবে..২২৫

ক্বায়দা-১১: সীয়াক্বুন নছ্ব তথা নছ্বের প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষাপট 'আম নছ্বকে নির্দিষ্ট করতে পারে..২২৭

ক্বায়দা-১২: 'আম নছ্বকে 'উরফ তথা সামাজিক প্রচলন বা রীতির দ্বারা খাছ্ব করা যাবে না চাই সেই প্রচলনটি মৌখিক হোক অথবা কার্য-বিষয়ক হোক..২২৯

ক্বায়দা-১৩: ছাহাবীর বক্তব্য কখনো কখনো 'আম নছ্বকে খাছ্ব তথা নির্দিষ্ট করতে পারে..২৩০

ক্বায়দা-১৪: 'আম নছ্বকে শুধুমাত্র বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে খাছ্ব বা নির্দিষ্ট করা সঠিক নয়..২৩১

ক্বায়দা-১৫: ‘আম নছ্বকে ক্বিয়াসের দ্বারা খাছ্ব বা নির্দিষ্ট করা যাবে না..........২৩২

ক্বায়দা-১৬: যেমনিভাবে দলীল এর সাহায্যে “সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত এমন নছ্বকে” সার্বিক অর্থে প্রয়োগ করা শরী‘আতসম্মত নয় ঠিক তেমনিভাবে দলীলের সাহয্যে “সার্বিক হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত এমন নছ্বকে” সীমাবদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করা শরী‘আতসম্মত নয়..........২৩২

ক্বায়দা-১৭: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা বক্তব্য উম্মতের প্রত্যেকের জন্যই প্রযোজ্য, তবে নির্দিষ্টতার দলীল থাকলে ভিন্ন কথা..........২৩৩

ক্বায়দা-১৮: কোনো একজনকে সম্বোধন করে প্রণিত বিধান উম্মতের সকলের জন্যই প্রযোজ্য..........২৩৫

ক্বায়দা-১৯: পুরুষকে সম্বোধন করে উল্লেখিত বিধানে নারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া..........২৩৬

ক্বায়দা-২০: কয়েকটি বাক্যের পরে আসা ইস্তিছনা (পূর্বে বর্ণিত বিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সদস্যদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক সদস্যকে বাদ দেওয়া) তার পূর্বের সকল বাক্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে..........২৩৬

ক্বায়দা-২১: মূলনীতি হলো কর্মের বিবরণ সংশ্লিষ্ট কর্মটি ‘আম হওয়ার দলীল বলে বিবেচিত হবে..........২৩৭

ক্বায়দা-২২: মুত্বলাক্ব (সার্বিকতার অর্থবিশিষ্ট) নছ্বকে মুক্বায়্যাদ (সীমাবদ্ধ অর্থবিশিষ্ট) নছ্ব এর অর্থে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে শর্ত হলো উভয়টি একই বিধানের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে..........২৩৯

ক্বায়দা-২৩ : যখন এমন দুইটি ‘আম নছ্ব এর মাঝে বৈপরীত্য পাওয়া যাবে যেই দুইটির মাঝে সামঞ্জস্যবিধান করা সম্ভব তখন উভয়টির মাঝে সামঞ্জস্যবিধানই সর্বোত্তম কাজ হবে। আর যদি সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব না হয় তাহলে উভয়টির মধ্যে কোনো একটিকে অপরটির উপরে প্রাধান্য দেওয়া ওয়াজিব হবে..........২৪০

ক্বায়দা-২৪: জোরালো তাগিদের সাথে বর্ণিত হওয়া ‘আম নছ্ব থেকেও কিছু অংশ বাদ দেওয়া যায়..........২৪১

ক্বায়দা-২৫: যখন শরী‘আত প্রণেতা উম্মাহকে কোনো (সাধারণভাবে) কার্য সম্পাদনের আদেশ দেন অথবা কোনো বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, এরপরে উম্মাহর কোনো একজনকে (বিশেষভাবে) উক্ত আদেশের আওতা থেকে পৃথক করে সাধারণ মানুষদেরকে দেওয়া আদেশের বিপরীত কোনো কার্য সম্পাদনের আদেশ দেন তখন সেই আদেশটি উক্ত ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়, আর সেই

বিপরীতমুখী আদেশের মধ্যে ঐ ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যার অবস্থা বিশেষভাবে আদিষ্ট উক্ত ব্যক্তির সাথে মিলে যায়..........২৪২

অধ্যায়ঃ ১৪-অব্যক্ত বোধগম্য মর্ম সম্পর্কে নীতিমালা

ক্বায়দা-১ঃ মাফহূমুল মুওয়াফাক্বাহ (সামঞ্জস্যপূর্ণ অব্যক্ত মর্ম) প্রমাণযোগ্য দলীল..........২৪৪

ক্বায়দা-২ঃ মাফহূমুল মুখালাফাহ (বিপরীতমুখী অব্যক্ত মর্ম) প্রমাণযোগ্য দলীল..........২৪৫

ক্বায়দা-৩ঃ যখন কোনো দলীল এই দিকে ইঙ্গিত করে যে যেই বিষয়টিকে উল্লেখ করা হয়েছে তা বিধানটির সঙ্গে নির্দিষ্ট নয় তখন মাফহূমুল মুখালাফাহ প্রমাণযোগ্য দলীল হতে পারে না..........২৪৬

অধ্যায়ঃ ১৫

শারঈ শব্দাবলির মর্মসমুহের সঠিক ব্যাখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গঠিত বিবিধ নীতিমালা

ক্বায়দা-১ঃ কিতাব ও সুন্নাহে বর্ণিত শব্দগুলোকে শরী'আতসম্মত হাক্বীক্বী (প্রকৃত) অর্থে প্রয়োগ করা ওয়াজিব..........২৪৮

ক্বায়দা-২ঃ কিতাব ও সুন্নাহ এর মাঝে বর্ণিত শব্দের ব্যাখ্যা "ক্বুরআন ও সুন্নাহ এর মাঝে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট শব্দের অনুরূপ অন্যান্য শব্দাবলি" দ্বারা করা ওয়াজিব..........২৪৯

ক্বায়দা-৩ঃ কিতাব ও সুন্নাহে বর্ণিত প্রতিটি শব্দের দাবিকে স্বীকার করা ও সেই শব্দাবলির মর্যাদা রক্ষা করা ওয়াজিব..........২৪৯

ক্বায়দা-৪ঃ কিতাব ও সুন্নাহে বর্ণিত না-সূচক শব্দ দ্বারা সম্পূর্ণ ওয়াজিব বিধানটিকে নাকচ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, শুধুমাত্র মুস্তাহাব এর পূর্ণতাকে নাকচ করা উদ্দেশ্য হয় না..........২৫০

ক্বায়দা-৫ঃ হাদীছসমূহে কোনো আমল "ক্ববূল না করার মর্মে যেই না-সূচক শব্দ" বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা উক্ত আমলটির সঠিকতাকে নাকচ করে দেওয়া আবশ্যক হয় না এবং উক্ত আমলটি আদায় করা হয়নি এমনটাও উদ্দেশ্য করা আবশ্যক হয় না..........২৫১

ক্বায়দা-৬ঃ কিতাব ও সুন্নাহ এর মাঝে যখন كلمة — শব্দটি প্রয়োগ করা হবে তখন এর দ্বারা পূর্ণ বাক্য উদ্দেশ্য হবে..........২৫২

ক্বায়দা-৭: যদি কিতাব ও সুন্নায় বর্ণিত কোনো বাক্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ অর্থে প্রয়োগ করা যায় তাহলে উক্ত বাক্যটিকে বারবার ও পুনরাবৃত্তির অর্থে প্রয়োগ করা যাবে না........২৫৫

ক্বায়দা-৮: কোনো বিধানকে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার সাথে সংযুক্ত করে দেওয়াটা এই বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে যে উক্ত বিধানটি সংশ্লিষ্ট সংখ্যা ব্যতীত অন্য যেকোনো সংখ্যার ক্ষেত্রে অকার্যকর বলে বিবেচিত হবে চাই অন্য সংখ্যাটি সংশ্লিষ্ট সংখ্যার চাইতে বড় হোক অথবা ছোট হোক........২৫৬

ক্বায়দা-৯: একত্রে সংযুক্ত থাকার প্রমাণ তখন শক্তিশালী হবে যখন দুইটি সহাবস্থানরত বিষয়কে এমন একটি শব্দ একত্রে সংযুক্ত করবে যেই (সংযুক্তকারী) শব্দটি প্রায়োগিকভাবে একটি অপরটির সাথে মিলে যায় এবং শব্দটির মর্ম বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংযুক্ত শব্দ দুইটি মর্মগত দিক থেকে একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়........২৫৮

ক্বায়দা-১০: কোনো শব্দের মর্ম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভাষাবিদদের ব্যাখ্যার উপরে ফক্বীহদের ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে........২৬০

অধ্যায়-১৬: দায়িত্বমূলক বিধি-বিধানের নীতিমালা

ওয়াজিব এর সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: ওয়াজিব ও ফরযের মধ্যে পার্থক্য করা ছ্বহীহ নয়........২৬৩

ক্বায়দা-২: যেই ওয়াজিব কর্ম সম্পাদনের কোনো নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়নি এমন ওয়াজিব কর্ম তাৎক্ষণিকভাবে সম্পাদন করা ওয়াজিব........২৬৩

ক্বায়দা-৩: যখন কোনো ওয়াজিব পূর্ণরূপে সম্পাদন করা সম্ভব না হয় তখন মুসলিম ব্যক্তি সেই ওয়াজিব কর্মটি স্বীয় সাধ্যানুযায়ী সম্পাদন করবে........২৬৪

ক্বায়দা-৪: যেই কর্ম ব্যতীত ওয়াজিব পূর্ণ হয় না সেই কর্ম সম্পাদন করাও ওয়াজিব........২৬৪

ক্বায়দা-৫: শর্তযুক্ত ওয়াজিব সম্পাদন করা ওয়াজিব নয়, যতক্ষণ না শর্ত পূর্ণ হয়........২৬৮

ক্বায়দা-৬: যেই ওয়াজিব কর্মের জন্য শরী'আত প্রণেতা কোনো সীমা বেধে দেননি এমন কর্ম দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য ততটুকু পরিমাণ সম্পাদন করা ওয়াজিব যতটুকু পরিমাণ সম্পাদন করলে সে নিশ্চিত হতে পারে যে সে উক্ত ওয়াজিব কর্মটির ততটুকুই সম্পাদন করেছে যতটুকু সম্পাদন করা তার জন্য ওয়াজিব ছিল........২৬৯

ক্বায়দা-৭: স্বেচ্ছাধিকার সম্বলিত ওয়াজিব দায়ভার থেকে মুক্ত হয়ে যায় একাধিক কর্মগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি ওয়াজিব সম্পাদন করার দ্বারাই, ওয়াজিবকৃত প্রত্যেকটি কর্ম সম্পাদন করা শরী'আতসম্মত নয়......২৭০

ক্বায়দা-৮: ওয়াজিবে কিফায়া (ফরযে কিফায়া) হলো এমন ওয়াজিব কর্ম যা কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সম্পাদন করার মাধ্যমে অন্যরা সে দায়ভার থেকে মুক্ত হয়ে যায়......২৭১

ক্বায়দা-৯: যখন দুইটি ওয়াজিবের একটি অপরটির সঙ্গে সাংঘর্ষিক প্রমাণিত হবে তখন উভয়টির মধ্যে যেই ওয়াজিবটি অত্যধিক গুরুত্বের সাথে অপরিহার্য হওয়ার দাবি রাখে সেই ওয়াজিবটিই প্রাধান্য পাবে......২৭৩

ক্বায়দা-১০: ওয়াজিব কর্মকে একমাত্র ওয়াজিব কর্ম ব্যতীত অকার্যকর করতে পারবে না......২৭৪

ক্বায়দা-১১: সম্প্রসারিত ওয়াজিব (ওয়াজিবুল মাওসূ') কর্ম শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়......২৭৫

ক্বায়দা-১২: প্রত্যেক এমন শব্দ যা থেকে বুঝা যায় যে কোনো একটি কর্ম সম্পাদন করা অপরিহার্য এমন শব্দকে সংশ্লিষ্ট কর্মটি ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ের দলীলরূপে গ্রহণ করা হবে......২৭৫

মানদূব (পালন করা বাঞ্ছনীয়) এর সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: মানদূব সম্পর্কে জানার্জন করা ওয়াজিবে কিফায়া (ফরযে কিফায়া) ২৭৬

ক্বায়দা-২: মানদূব কর্ম শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয় না......২৭৬

ক্বায়দা-৩: যদি কোনো সুন্নাহ আদায় করলে ফিতনার আশঙ্কা হয় তাহলে সম্প্রীতি বজায় রাখতে উক্ত সুন্নাহ সম্পর্কে মানুষ জানার পূর্বপর্যন্ত সাময়িকভাবে তা পরিত্যাগ করবে......২৭৮

ক্বায়দা-৪: মানদূব কর্ম পরিত্যাগ করা যাবে না যদিও তা বিদ'আতীদের নিদর্শনে পরিণত হয়......২৭৮

ক্বায়দা-৫: কল্যাণ (মাছলাহাত) বিবেচনায় একই আমল কখনো সম্পাদন করা মুস্তাহাব, আবার কখনো পরিত্যাগ করা মুস্তাহাব......২৭৯

ক্বায়দা-৬: নফল আমল সম্পাদন করা হারাম যখন তা ওয়াজিব পরিত্যাগ করার দিকে ধাবিত করে……………………………………………………………………২৮০

ক্বায়দা-৭: যখন দুইটি মুস্তাহাব কর্ম সাংঘর্ষিক হবে তখন অধিক উত্তম কর্মটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে……………………………………………………………২৮০

ক্বায়দা-৮: যেই কর্ম শরী‘আত প্রণেতার উদ্দেশ্য পূরণে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তা সম্পাদন করাও শরী‘আত প্রণেতার নিকট অধিক পছন্দনীয়…………………………২৮১

ক্বায়দা-৯: মুস্তাহাব হলো এমন বিধান যা দলীল ব্যতীত সাব্যস্ত হতে পারে না……………………………………………………………………………২৮১

মাকরূহ (অপছন্দনীয়) এর সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: মাকরূহ প্রত্যেক এমন কর্ম যেই কর্ম সম্পাদনে শরী‘আত প্রণেতা কঠোরভাবে কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি……………………………………২৮২

ক্বায়দা-২: শারঈ বিষয়ে “মাকরূহ” শব্দটি দ্বারা “হারাম” বুঝানো উদ্দেশ্য……………………………………………………………………………২৮২

হারাম (নিষিদ্ধ) এর সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: হারাম বিষয়সমূহ নিষিদ্ধ (হারাম) হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের হয়……………………………………………………………………………২৮৪

ক্বায়দা-২: যেই কর্ম পরিত্যাগ করা ছাড়া হারাম কর্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়, সেই কর্ম পরিত্যাগ করাও ওয়াজিব……………………………………………২৮৫

ক্বায়দা-৩: কোনো বস্তুকে হারাম করার দ্বারা উক্ত বস্তুর প্রত্যেকটি অংশকে হারাম করা হয়……………………………………………………………………২৮৫

ক্বায়দা-৪: যেই কর্ম হারাম কর্মের দিকে ধাবিত করে তা হারাম………………২৮৬

ক্বায়দা-৫: মানুষ হারাম কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে গুনাহগার হবে যদিও সে তা সম্পাদন না করে যখন সে উক্ত কর্মটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য পরিত্যাগ না করে……………………………………………………………২৮৭

ক্বায়দা-৬: প্রত্যেক এমন শব্দ যা কোনো একটি কর্ম পরিত্যাগ করার অপরিহার্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে সেই শব্দের প্রয়োগ থেকে উক্ত কর্ম হারাম হওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করতে হবে………………………………………………………২৮৯

মুবাহ (বৈধ) এর সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: সকল বস্তুর মৌলিক অবস্থা **হলো** তা মুবাহ বা বৈধ......................২৯০

ক্বায়দা-২: মানুষ কোনো বৈধ কর্ম স্থায়ীভাবে করতে থাকলে তার জন্য কোনো গুনাহ হয় না..২৯২

ক্বায়দা-৩: মানুষ তার বৈধ কৃতকর্মের কারণেও ছাওয়াব পাবে যখন উক্ত বৈধ কৃতকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সে তার নিয়্যাতকে সঠিক রাখবে..........................২৯২

বান্দার সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: দায়িত্ব প্রযোজ্য হওয়ার জন্য ‘ইলম তথা সংশ্লিষ্ট কর্মের বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা এবং তা পালন করার সামর্থ থাকা শর্ত...................................২৯৩

ক্বায়দা-২: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো কর্মের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে তার অজ্ঞতার অজুহাতকে গ্রহণ করা হবে (তাকে ক্ষমা করা হবে) যদি সে তার অজানা কর্মটি সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে অবহেলা না করে থাকে..............................২৯৫

ক্বায়দা-৩: আল্লাহ তা’আলার হক্বের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ক কর্ম ছ্বহীহ হওয়ার জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিয়্যাত থাকা শর্ত। আর মানুষের হক্বের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ক কর্ম ছ্বহীহ হওয়ার জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিয়্যাত থাকা শর্ত নয়..২৯৫

ক্বায়দা-৪: শারঈ সামর্থ্য হলো এমন সামর্থ্য যেই সামর্থ্য দ্বারা কোনো কর্ম আদায় করা যায় ব্যাপক মাত্রায় বিস্তৃত অকল্যাণ সংঘটিত হওয়া ছাড়াই.....................২৯৬

ক্বায়দা-৫: যে ব্যক্তি সাবালক (প্রাপ্তবয়স্ক) হয়নি অথবা যার বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে গেছে সে দায়িত্বপ্রাপ্ত (ইবাদতের দায়িত্বপ্রাপ্ত) নয়...২৯৭

ক্বায়দা-৬: দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় এমন ব্যক্তি থেকে সংঘটিত কোনো কথা ও কর্মের জন্য কোনো বিধান প্রযোজ্য হবে না...২৯৭

ক্বায়দা-৭: সম্পদ ও বিনষ্ট বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে কারো ওযর গ্রহণ করা হবে না...২৯৯

অধ্যায়ঃ ১৭-তাক্বলীদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: যার নিকট দলীল পৌঁছে গেছে অথবা যে দলীল অনুসন্ধান করার সামর্থ্য রাখে তার জন্য দলীল পরিত্যাগ করে কোনো আলেমের তাক্বলীদ করা শরী'আতসম্মত নয়, চাই সে যতবড় আলেমই হোন না কেন............৩০০

ক্বায়দা-২: তাক্বলীদের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি দীনের সকল অংশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, দীনের কোনো অংশই তাক্বলীদের নিষেধাজ্ঞার বাহিরে থাকবে না............৩০৫

ক্বায়দা-৩: তাক্বলীদ ঐ ব্যক্তির জন্যই শরী'আতসম্মত যে কোনো বিশেষ কারণে দলীল অনুসন্ধান ও তা যাচাই করতে পারে না............৩০৬

ক্বায়দা-৪: যেই মাসআলায় সালাফগণের মতামত পাওয়া যাবে সেই মাসআলায় তাদের সিদ্ধান্তের বাহিরে যাওয়া যাবে না............৩০৭

ক্বায়দা-৫: প্রত্যেক মুজতাহিদ (প্রত্যেক মাসআলায়) সঠিক মতের অধিকারী হোন না............৩০৮

ক্বায়দা-৬: এমন যেকোনো ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা হবে যে কোনো মাসআলায় সঠিক দলীলের বিরোধিতা করেছে............৩১১

ক্বায়দা-৭: মতানৈক্য থেকে বের হওয়া মুস্তাহাব............৩১২

ক্বায়দা-৮: যেই মাসআলায় কোনো ইমাম কোনো মত দেননি সেই মাসআলায় কোনো মন্তব্য করা যাবে না............৩১৩

ক্বায়দা-৯: যার নিকট একজন আলেমের বক্তব্যের উপরে অন্যকোনো আলেমের বক্তব্য প্রাধান্যযোগ্য মনে হয়েছে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না............৩১৪

ক্বায়দা-১০: আলেমদের বক্তব্য গ্রহণ করা হবে এবং তা দ্বারা সত্য পথের নির্দেশনা অনুসন্ধান করা হবে কিন্তু তা দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না............৩১৫

ক্বায়দা-১১: মুক্বাল্লিদ ব্যক্তির জন্য আলেম নয় এমন ব্যক্তি থেকে ফতোয়া চাওয়ার অনুমতি নেই............৩১৬

ক্বায়দা-১২: কোনো মাসআলাতেই অধিকাংশ আলেমদের বক্তব্য সঠিক সাব্যস্ত হতে পারে না যদি তা দলীল সমৃদ্ধ না হয়............৩১৭

ক্বায়দা-১৩: শরী'আতসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য মতানৈক্য হলে সেই মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে কোনো বাদানুবাদ ও ঝগড়া করা যাবে না............৩১৮

ক্বায়দা-১৪: কারো জন্য একটি মতকে অপর মতের উপরে দলীল ব্যতীত অগ্রাধিকার দেওয়া জায়েয নেই, আবার কোনো মতের প্রবক্তাকে অপর মতের প্রবক্তার উপরে দলীল ব্যতীত অগ্রাধিকার দেওয়া জায়েয নেই......................৩১৯

অধ্যায়: ১৮-পাঁচটি বড় ফিক্বহী নীতিমালা সম্পর্কে

ক্বায়দা-১: সকল বিষয়ের ফলাফল নির্ধারিত হয় উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে...............৩২১

ক্বায়দা-২: ইয়াক্বীন (নিশ্চিতরূপে সাব্যস্ত বিষয়) কখনো সংশয়ের দ্বারা বিলুপ্ত হয় না..৩২৩

ক্বায়দা-৩: কষ্ট-বিপদ সহজিকরণকে ত্বরান্বিত করে। আর জরূরী প্রয়োজন নিষিদ্ধ কর্মসমূহকে বৈধ সাব্যস্ত করে..৩২৪

ক্বায়দা-৪: অন্যের ক্ষতি করা যাবে না এবং নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না..৩২৬

ক্বায়দা-৫: লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি অনুসরণ করা হবে....................৩২৬

অধ্যায়: ১৯-বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: কোনো একটি নছের মাঝে একটি বিষয়কে অপর বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য করার অর্থ এই নয় যে, দ্বিতীয়টি সকল ক্ষেত্রে প্রথমটির বিধানকে গ্রহণ করবে..৩২৮

ক্বায়দা-২: কোনো কিছুর প্রবেশপথ বন্ধ করার জন্য যদি কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় তাহলে উক্ত নিষেধাজ্ঞা তখনই বৈধ হয় যখন তার সাথে অগ্রাধিকারমূলক কল্যাণ জড়িত হয়...৩২৯

ক্বায়দা-৩: আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের শরী'আত আমাদের শরী'আত হিসেবেই বিবেচিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমাদের শরী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক না হবে..৩২৯

ক্বায়দা-৪: হীলা দুই প্রকার: হারাম (নিষিদ্ধ) হীলা যা হারামকে হালাল করার দিকে নিয়ে যায়, আর আরেক প্রকার হীলা হলো যা হারাম নয় এবং যা কোনো হারামকে হালাল করার দিকে নিয়ে যায় না...................................৩৩১

ক্বায়দা-৫: কোনো কিছু সংঘটিত হওয়ার সংবাদ প্রদান করা দ্বারা তা জায়েয হওয়া বা হারাম হওয়া কোনটার দিকেই ইঙ্গিত করে না......................৩৩২

ক্বায়দা-৬: মাসআলাসমূহকে উছূল (মূল মাসআলা) ও ফুরূ' (শাখাগত মাসআলা) এই দুই ভাগে ভাগ করা ছহীহ নয়..........৩৩৩

ক্বায়দা-৭: শারঈ বিধানসমূহের ভিত্তি কল্যাণসমূহের বাস্তবায়ন ও তা পূর্ণকরণের উপরে প্রতিষ্ঠিত..........৩৩৫

ক্বায়দা-৮: শারঈ বিধানসমূহের ভিত্তি পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়াবলির উপরে প্রতিষ্ঠিত..........৩৩৫

ক্বায়দা-৯: শারঈ বিধানসমূহের ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয়টি হলো মর্ম - তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যসমূহ, শব্দসমূহ নয়..........৩৩৬

ক্বায়দা-১০: সাধারণ-সার্বজনীন বিষয়ের আলোকেই বিধান প্রযোজ্য হয়, বিরল বিষয় ধর্তব্য নয়..........৩৩৮

ক্বায়দা-১১: শারঈ যেই বিধানসমূহের জন্য শরী'আত প্রণেতা নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করেছেন সেগুলো কাল অথবা স্থানের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় না..........৩৩৮

ক্বায়দা-১২: উপকার অর্জনের চেয়ে ক্ষতি দূর করা অধিক উত্তম..........৩৩৯

ক্বায়দা-১৩: কোনো আমল সম্পন্ন হলেই তার বিনিময়ে ছাওয়াব পাওয়া আবশ্যক নয়..........৩৪০

অধ্যায়: ২০-বিদ'আত সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: ইবাদতের মূল বিষয় হলো নিষিদ্ধতা (যতক্ষণ না দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়)। আর স্বভাবজাত বিষয়াবলির মৌলিক অবস্থা হলো বৈধতা (যতক্ষণ না নিষেধ হয়)..........৩৪২

ক্বায়দা-২: শরী'আতে বিদ'আতে হাসানাহ বলতে কিছু নেই। বরং প্রত্যেকটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা..........৩৪৩

ক্বায়দা-৩: প্রত্যেকটি বিদ'আতই হারাম, কোনো বিদ'আতই মাকরূহ নয়..........৩৪৯

ক্বায়দা-৪: সুন্নাতের মাঝে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, বিদ'আতের মাঝে ব্যাপক প্রচেষ্টার চেয়ে অধিক উত্তম..........৩৫১

ক্বায়দা-৫: ভালো নিয়্যাত কোনো বিদ'আতকে বিদ'আত মুক্ত করতে পারে না..........৩৫২

ক্বায়দা-৬: কোনো কর্ম বিদ'আত কি না এই ব্যাপারে মতানৈক্য থাকলে উক্ত মতানৈক্যের কারণে সেই কর্মটি সম্পাদন করা বৈধ নয়..........৩৫৩

ক্বায়দা-৭: কোনো ইবাদত দলীল ব্যতীত মানুষের মাঝে ব্যাপকহারে প্রচলিত হলেই তা শরী'আতসম্মত হয় না..৩৫৪

ক্বায়দা-৮: মূলনীতি হলো কোনো ইবাদতের মাঝে নতুন কোনো কর্ম (বিদ'আত) অন্তর্ভুক্ত করার দ্বারা সম্পূর্ণ ইবাদতটি নষ্ট হয়ে যায় না, যতক্ষণ না অতিরিক্ত কর্মটি মূল ইবাদতের মাঝে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র উক্ত অতিরিক্ত (বিদ'আত) কর্মটিই নষ্ট হয়ে যায়..৩৫৫

ক্বায়দা-৯: যেই ইবাদতকে শরী'আত প্রণেতা সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন সেই ইবাদতকে কোনো কাল অথবা স্থান অথবা বিশেষ গুণ অথবা কোনো সংখ্যার সাথে সীমাবদ্ধ করা যাবে না..৩৫৫

ক্বায়দা-১০: যেই ইবাদত নির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্যসহ ধার্য করা হয়েছে সেই ইবাদতকে পূর্ণরূপে পালন না করে কোনো একটি নির্দিষ্ট অংশ পালন করা বিদ'আত বলে বিবেচিত হবে..৩৫৭

ক্বায়দা-১১: মানুষকে তাদের রবের দিকে আহবান করার জন্য নতুন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা শরী'আতসম্মত নয়..৩৫৮

ক্বায়দা-১২: কোনো ছাহাবী থেকে যখন কোনো ইবাদত পালন করার বর্ণনা পাওয়া যাবে তখন সেই ইবাদতটি বিদ'আত নয়, বরং শরী'আতসম্মত বলে বিবেচিত হবে..৩৬৩

ক্বায়দা-১৩: নির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্য অথবা কারণসহ কোনো ইবাদত বর্ণিত হলে সেই ইবাদত সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা কারণ ব্যতীত আদায় করা বিদ'আত বলে বিবেচিত হবে..৩৬৪

ক্বায়দা-১৪: মুবাহ (বৈধ) বিষয়কে দীন হিসেবে গ্রহণ করা শরীয়াসম্মত নয়..৩৬৪

ক্বায়দা-১৫: মাছলাহাহ মুরসালাহ-জনকল্যাণমূলক কাজ বিদ'আত নয়..........৩৬৫

ক্বায়দা-১৬: উছূলী (মৌলিক) পর্যায়ের বিদ'আত এবং ফুরূঈ (শাখাগত) পর্যায়ের বিদ'আতের মাঝে পার্থক্য করা ছহীহ নয়..৩৬৯

ক্বায়দা-১৭: যেই বিষয়টির মূল ভিত্তি শরী'আতসম্মত হওয়াটা প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু তা ধারাবাহিকভাবে পালনীয় হয়নি এমন বিষয় ধারাবাহিকভাবে পালন করা শরী'আতসম্মত নয়..৩৭১

ক্বায়দা-১৮: যেই মুজতাহিদের ইজতিহাদ তাকে বিদ'আতে পতিত করে তার উক্ত ইজতিহাদকৃত কর্মটিকে বিদ'আতই বলা হবে যদিও সেই কর্মের প্রবক্তা কোনো সালাফই হোক না কেন..৩৭১

ক্বায়দা-১৯: যেভাবে ইবাদতের মাঝে কোনো কিছু বৃদ্ধি করা বিদ'আত বলে বিবেচিত হবে, তেমনি ইবাদতের মাঝে কোনো কিছু কমতি করাও বিদ'আত বলে বিবেচিত হবে.....৩৭২

ক্বায়দা-২০: বিদ'আতের নিকটবর্তী করে এমন কর্মের পথ বন্ধ করে দেয়া ওয়াজিব.....৩৭৩

ক্বায়দা-২১: বিদ'আত নাকি বিদ'আত নয় এমন প্রত্যেক সংশয়পূর্ণ আমল করা শরীয়াসম্মত নয়.....৩৭৩

ক্বায়দা-২২: বিদ'আতীদের সাথে লেনদেন ও তাদের থেকে 'ইলম গ্রহণের ক্ষেত্রে কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা (সতর্ক থাকা) ওয়াজিব.....৩৭৩

ক্বায়দা-২৩: একজন মুসলিম ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হবে তার মাঝে বিদ্যমান কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং সুন্নাহ ও বিদ'আতের ভিত্তিতে, সীমালঙ্ঘন ব্যতীত.....৩৭৫

ক্বায়দা-২৪: বিদ'আতীদের হাতে কোনো কাফেরের ইসলাম গ্রহণ করা অধিক উত্তম কাফের থাকার চেয়ে.....৩৭৬

ক্বায়দা-২৫: যে আহলুল হাদীছ ও আহলুস সুন্নাহের মানহাজের বিরোধিতা করে, আর তার মানহাজ কোনো একটি জামা'আত বা দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তবে তাকে উক্ত জামা'আত অথবা উক্ত দলের দিকেই সম্পৃক্ত করা হবে। তবে তার নিকট দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত তাকে বিদ'আতী বলা যাবে না.....৩৭৭

ক্বায়দা-২৬: বিদ'আতে লিপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই বিদ'আতী নয়.....৩৭৮

অধ্যায়: ২১

ঐ সকল নীতিমালা যেগুলো কোনো হাদীছকে ছ্বহীহ অথবা দ্বঈফ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা ছ্বহীহ নয়

প্রথমত: ঐ সকল ক্বায়দা যা কোনো হাদীছকে ছ্বহীহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা ছ্বহীহ নয়.....৩৮৩

দ্বিতীয়ত: ঐ সকল ক্বায়দা যা কোনো হাদীছকে দুর্বল সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা ছ্বহীহ নয়.....৩৮৯

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, শুধুমাত্র তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমরা আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের নিজেদের অনিষ্ট এবং অকল্যাণমূলক কার্যক্রম থেকে। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই"। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, "মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল"। অতঃপর,

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ بني إسرائيل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً»، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»

"নিশ্চয় বনূ ইসরাঈল বাহাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছিলো। আর আমার উম্মত তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে মাত্র একটি দল ব্যতীত অন্য সকলেই জাহান্নামে যাবে"। ছাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রসূল, সেটা কোন দল? তিনি বললেন: "আমি ও আমার ছাহাবীগণ যেই মত ও আদর্শের উপরে আছি, এই আদর্শের উপরে যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে"।

ইমাম তিরমিযী তার সুনানে (৫/২৬, হা/২৬৪১), আজুররী আশ শারী'আহ (৫১ পৃষ্ঠা), লালকায়ী শারহু 'ইতিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ এর (১/১০০), ত্বাবারানীসহ আরও অনেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, হাদীছটি সম্মিলিত সকল সনদের ভিত্তিতে হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।

এই হাদীছটি প্রমাণ করে যে, (শেষ উম্মতের মধ্যে) বহু মত ও আদর্শের জন্ম হবে। আর ছাহাবীগণের আদর্শের ওপরে যারা চলবে একমাত্র তারাই ক্বিয়ামতের দিবসে মুক্তি পাবে। এই দলগুলোর মধ্যে কোন দলটি ছাহাবীগণের মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত? বাস্তবিকপক্ষে সেই দলটি হলো ‘আহলুল হাদীছ ওয়াস সুন্নাহ। এরাই হলো একমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত ও নাজাতপ্রাপ্ত দল। আর হে সম্মানিত পাঠক! আলোচ্য কিতাবে এই বিষয়ের প্রমাণ তুমি অচিরেই দেখতে পাবে। ‘একমাত্র আহলুল হাদীছগণই হলো সাহায্যপ্রাপ্ত ও নাজাতপ্রাপ্ত দল’ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই কিতাবে। আর এই কিতাবে প্রকৃত আহলুল হাদীছ কারা, তাদের মত ও পথ এবং তাদের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ‘আল্লাহ যেনো আমাদেরকে প্রকৃতপক্ষে এবং বাস্তবিক অর্থেই আহলুল হাদীছ এর অন্তর্ভুক্ত করে দেন’ এটাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। এই বিষয়ে তিনিই একমাত্র অভিভাবক ও প্রকৃত ক্ষমতাবান।

আমাদের নবী – মুহাম্মাদ – ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -, তাঁর পরিবার পরিজন ও তাঁর সকল ছাহাবীগণের উপর আল্লাহর ছলাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

যাকারীয়া ইবনে গুলাম ক্বাদীর পাকিস্থানী

অধ্যায়ঃ ১

الدليل على أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة وثناء الأئمة على أهل الحديث وفقههم

‘আহলুল হাদীছগণই একমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত দল’ এ বিষয়ে দলীল এবং আহলুল হাদীছদের মর্যাদা ও তাদের পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে ইমামগণের প্রশংসামূলক বাণী।

ছুহীহ বুখারী (হা/৭১) ও ছুহীহ মুসলিমে (হা/১৫২৪) মু'আবীয়া - রদ্বীয়াল্লাহু আনহু - থেকে বর্ণিত আছে। নাবী - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - বলেছেন:

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ.

"আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর হুকুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে অথবা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবে তারা ক্বিয়ামত ক্বায়েম হওয়া পর্যন্ত মানুষের উপর বিজয়ী থাকবে"।

তিরমিযীর (হা/২১৯২) একটি বর্ণনাতে মু'আবীয়া বিন ক্বুররার হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যা তিনি তার পিতা থেকে, তিনি সরাসরি নাবী - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - থেকে বর্ণনা করেছেন:

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

"আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে (আল্লাহর পক্ষ থেকে), যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে, ক্বিয়ামত আসা পর্যন্ত তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না "।

আর 'আহলুল হাদীছগণই হলো একমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত ও নিষ্কৃতিলাভকারী দল' এই মর্মে ইমামগণের উক্তিসমূহ পর্যায়ক্রমে নিম্নে বর্ণিত করা হলো:

আবুল ফাতূহ আত ত্বঈ আল হামাযানী ‘কিতাবুল আরবাঈন’ - এ (১৬৩ পৃষ্ঠায়) বর্ণনা করেন: আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইয়াযীদ ইবনে হারূন ও ইবরাহীম ইবনুল হাসান দীযেল আল হামাযানীসহ

এই জাতীয় মুসলিম উম্মাহর বিরাটসংখ্যাক আলেম ও বিশিষ্ট বিখ্যাত ইমামগণের মতে হাদীছে আলোচিত ত্বয়েফাহ বা দল দ্বারা 'ঐ সকল আছ্বহাবুল হাদীছ ও আহলুল আছার' উদ্দেশ্য যারা যথার্থভাবে দীনের অনুসরণ করেছে, সুদৃঢ় সরল পথে চলেছে, যারা সর্বোচ্চ সঠিক পথ ও মানহাযকে আকড়ে ধরেছে।

শারাফু আছ্বহাবিল হাদীছ গ্রন্থে (৮ পৃষ্ঠা) খত্বীব আল বাগদাদী বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা আহলুল হাদীছকে শরী'আতের ভিত্তিরূপে স্থাপন করেছেন এবং তাদের দ্বারা প্রতিটি জঘন্য বিদ'আতকে ধ্বংস করেছেন। তাই তারা হলো পৃথিবীর বুকে আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে নির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক, নবী - ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - ও তাঁর উম্মতের মাঝে সেতু বন্ধন, তাঁর আদর্শ সংরক্ষণে কঠোর পরিশ্রমী। তাদের আলো উজ্জ্বলতায় ভরপুর, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব চিরস্থায়ী, তাদের প্রমাণগুলো চমৎকার, তাদের মত ও পথ সুস্পষ্ট, তাদের যুক্তি ও সনদ অপ্রতিরোধ্য। কোনো সম্প্রদায় প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো মতকে পছন্দ করলে তা আঁকড়ে বসে থাকে, অথবা কোনো চেতনাকে ভালো মনে করলে তার প্রতি নিবেদিত হয়ে যায়। কিন্তু আছ্বহাবুল হাদীছগণ তার ব্যতিক্রম। কারণ; আল্লাহর কিতাব হলো তাদের সীমারেখা, আর সুন্নাহ হলো তাদের দালীলিক ভিত্তি। রসূল হলেন তাদের আদর্শ, তাঁর সঙ্গেই তাদের যোগ-সূত্র। তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না, মানব উদ্ভাবিত মতাদর্শের প্রতি গ্রাহ্য করে না। বরং রসূলের থেকে যা (বিশুদ্ধ সনদে) বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোই তারা গ্রহণ করে। তারা এই ব্যাপারে বিশ্বস্ত, দীনের সংরক্ষক ও প্রহরী, জ্ঞানের আধার ও বাহক। যখন কোনো হাদীছ - এর বিশুদ্ধতায় মতানৈক্য সৃষ্টি হবে, তখন তাদের কাছেই এই বিষয়ে স্মরণাপন্ন হতে হবে। তারা হাদীছের ব্যাপারে যা হুকুম দিবে দিবে, সেটিই গ্রহণযোগ্য ও শ্রবণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাদের প্রত্যেক আলেমই ফক্বীহ, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও মেধাবী, প্রত্যেকেই স্ব স্ব গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুনিয়াবিমুখ, মহত্বের গুণে গুণান্বিত, দক্ষ পাঠক, চমৎকার বক্তা। তারা হলেন বিরাটসংখ্যক একটি দল। আর তাদের পথ হলো সরল পথ। প্রত্যেক বিদআতী তাদের আক্বীদাহকে নিজের আক্বীদাহ বলে প্রকাশ করে এবং প্রকাশ্যে তাদের মতাদর্শের বিরোধিতা করার দুঃসাহসিকতা দেখায় না। যে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহ তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেন। আর যে তাদের প্রতি বিরোধিতা করে, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করেন। যে তাদেরকে পরিত্যাগ করে, সে তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। যে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে কখনোই সফল হতে পারে না। দীনের

ব্যাপারে সতর্ক ব্যক্তি তাদের পথনির্দেশনার মুখাপেক্ষী। তাদের প্রতি যারা কুদৃষ্টি দেয়, তারা বিষণ্ণ ও দুঃখিত হয়ে পড়ে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।

তিনি একই কিতাবে (১০ পৃষ্ঠাতে) আরো বলেছেন: রব্বুল 'আলামীন সাহায্যপ্রাপ্ত এই দলকে দীনের প্রহরী বানিয়েছেন। আর তারা সুসংহত শরী'আতকে দৃঢ়তার সহিত আঁকড়ে ধরেছেন এবং ছাহাবা ও তাবেঈনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন যার ফলে তাদেরকে শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে তিনি রক্ষা করেছেন। তাদের কাজ হলো মনোনীত নবীর শরী'আতে বিদ্যমান বিধিসমূহ বাছাইয়ের লক্ষ্যে আছারগুলোকে সংরক্ষণ করা ও দূর-দূরান্তের কণ্টকাকীর্ণ পথসমূহ পাড়ি দেওয়া। তারা এই বিধান পরিত্যাগ করে কখনো কোনো ব্যক্তিগত মত ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে না। তারা তাঁর শরী'আতকে কথা ও কাজে মান্য করে থাকে। তারা তাঁর সুন্নাহকে মুখস্থ করা ও তা অন্যের কাছে বর্ণনা করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন, এমনকি এর দ্বারা তারা এর নীতিগত ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর তারা এমনটি করার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারসম্পন্ন ছিলেন আর তারাই ছিলেন এর প্রকৃত ধারক বাহক।

ইবনু কুতায়বা 'তা'বীলু মুখতালাফিল হাদীছ' কিতাবে (৫১ পৃষ্ঠাতে) বর্ণনা করেছেন: আর আছ্বহাবুল হাদীছগণই সঠিকভাবে হক্বকে অনুসন্ধান করেছেন এবং এর সম্ভাব্য সকল দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করেছেন। তারা আল্লাহর রসূল - ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর সুন্নাহসমূহ অনুসরণ করে ও তাঁর আছার ও খবরগুলোকে আয়ত্ব ও আত্মস্থ করার লক্ষ্যে জল-স্থল পথ ও পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বকে পাড়ি দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করেছেন। তাদের একেকজন শুধুমাত্র একটি খবর বা সুন্নাহ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে নির্জন মরুপথ পাড়ি দিয়েছেন, যেনো তিনি

উক্ত হাদীছ এর বর্ণনাকারী থেকে সরাসরি উক্ত হাদীছটি গ্রহণ করতে পারেন। এরপরে তারা হাদীছগুলোর ব্যাপারে চুল-চেরা বিশ্লেষণ ও গবেষণা করতে থাকেন। ফলে তারা হাদীছগুলোর মধ্যে কোনটি ছ্বহীহ আর কোনটি ত্রুটিপূর্ণ, কোনটি নাসিখ আর কোনটি মানসূখ তা চিহ্নিত করতে সক্ষম হন এবং ফক্বীহগণের মধ্যে কারা হাদীছগুলোর বিরোধী মত পোষণ করেছেন তাও জানতে পারেন। এরপরে তারা উক্ত বিষয়টি সকলকে অবহিত করেন। যার কারণে সংশ্লিষ্ট হাদীছটি (যে হাদীছটি ছ্বহীহ বা নাসিখ) নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরেও আবার নতুনভাবে উদিত হয়, হারিয়ে যাওয়ার পরেও আবার

শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে উন্নীত হয়, বিচ্ছিন্ন থাকার পরেও আবার সংগঠিত হয়, আর যে সুন্নাহ থেকে বিমুখ ছিল, সে সুন্নাহ এর অনুসরণ করতে শুরু করে, আর যে তা থেকে অচেতন ছিল, সে উক্ত বিষয়ে অবহিত হয়।

ইবনু হিব্বান তার ছ্বহীহ মুসনাদের ভূমিকায় (১/৩৪) আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করার পরে বর্ণনা করেছেনঃ এরপরে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠতম কাজের জন্য একটি দলকে বাছাই করলেন, আর তাদেরকে তাঁর হেদায়েতের পথ আঁকড়ে ধরার পথ প্রদর্শন করলেন। অর্থাৎ সুন্নাহ ও আছারকে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে মহৎ ব্যক্তিদের পথে চলার হেদায়েত দিলেন। এরপরে তাদের হৃদয়কে ঈমান দ্বারা সুসজ্জিত করে দিলেন, তাদের জিহ্বাকে স্পষ্টভঙ্গিতে কথা বলার শক্তি দান করলেন। অর্থাৎ - সুন্নাহসমূহ সংকলন করা, প্রবৃত্তির চেতনার আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা এবং প্রবৃত্তির চেতনার আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে পরিত্যাগ করে সুন্নাহসমূহ ভালোভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে - আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর দীনের নিদর্শনগুলো স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করার পাশাপাশি অবিরত ভ্রমণ ও পথচলার মাধ্যমে এবং নিজ পরিবার ও মনোবাসনা ত্যাগ করে তাঁর নবীর সুন্নাহসমূহ অনুসরণ করার শক্তি দান করেছেন। ফলে এই সম্প্রদায় (আছ্বহাবুল হাদীছ) হাদীছের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে তা অনুসন্ধান করতে লাগল। আর তা অনুসন্ধান করতে দূর-দূরান্তের পথে যাত্রা করা শুরু করল, হাদীছ বিষয়ক কিতাব লিখতে লাগল, হাদীছ এর বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগল এবং সংশ্লিষ্ট হাদীছকে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত করতে থাকল, হাদীছ নিয়ে পরস্পর আলোচনা করতে লাগল এবং তা প্রচার করতে থাকল, হাদীছের উপর তারা পাণ্ডিত্য অর্জন করতে লাগল এবং সংশ্লিষ্ট হাদীছকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে থাকল, হাদীছ এর আলোকে বিধান প্রণয়ন করতে লাগল এবং এই বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকল। ফলে তারা মুরসালকে মুত্তাছ্বিল থেকে, মাওক্বূফকে মুনফাছ্বিল থেকে, নাসিখকে মানসূখ থেকে, মুহকামকে (সুদৃঢ় ও বিধিবদ্ধ বিধান) মাফসূখ (রহিত বিধান) থেকে, মুফাসসারকে (ব্যাখ্যাকৃত স্পষ্ট বিধান) মুজমাল (অস্পষ্ট বিধান) থেকে, মুসতা'মালকে (ব্যবহারযোগ্য বিষয়) মুহমাল (অনর্থক) থেকে, 'উমূমকে (ব্যাপক বিষয়) খূছূছ্ব (নির্দিষ্ট বিষয়) থেকে, দলীলকে মানছূছ্ব (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অভিব্যক্তি) থেকে, মুবাহকে (বৈধ বিষয়) মাহযূর (নিষিদ্ধ বিষয়) থেকে, গরীবকে মাশহূর থেকে, ফরয বিধানকে ইরশাদ (পরামর্শ বা উপদেশ) থেকে, হাতামকে (পালন করা অত্যাবশ্যক এমন বিধান) ইব'আদ (যেই কর্ম থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে) থেকে, 'আদিল রাবীদেরকে মাজরূহ

রাবীদেরকে থেকে এবং দ্বয়ীফ রাবীদেরকে মাতরূক রাবীদের থেকে পৃথক করেছে। আর এর পাশাপাশি তারা 'আমলযোগ্য হাদীছের মান ধার্য করে দিয়েছে এবং অজ্ঞাত ব্যক্তিদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে, অবশেষে আল্লাহ তাদের মাধ্যমে মুসলিমদের দীনকে রক্ষা করেছেন।

এই দীনকে তিনি নিন্দুকের নিন্দা থেকে রক্ষা করেছেন। আর তাদেরকে মতবিরোধের মীমাংসার ক্ষেত্রে হেদায়েতের দিশারী, দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যাবলির সমাধানে আঁধারের প্রদীপ বানিয়েছেন। সুতরাং তারা হলো নবীগণের ওয়ারিস, খাঁটি মানুষদের মিলনস্থল, ধর্মভীরুদের আশ্রয়স্থল, আল্লাহর বন্ধুদের প্রধান কেন্দ্র।

আর সাম'আনী ‘ছ্বওনুল মানত্বিক্ব’ কিতাবে (১৬৫-১৬৭ পৃষ্ঠা) বলেছেন, আর যে অন্যতম বিষয়টি আহলুল হাদীছ এর হক্ব হওয়ার দলীল তা হলো, যদি তুমি তাদের সকল গ্রন্থ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন কর, চাই সে গ্রন্থ প্রাচীন হোক কিংবা আধুনিক, তাদের মাতৃভূমি ও বর্ণনাকারী যতই ভিন্ন হোক না কেন, তাদের নিবাস যতই দূরত্বে অবস্থিত থাকুক না কেন, তাদের প্রত্যেকের বসবাসের এলাকা যতই দুরবর্তী হোক না কেন, তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে, তারা প্রত্যেকেই একই রীতিতে একই আদলে 'আক্বীদার বর্ণনা দিচ্ছে। তারা এই ক্ষেত্রে এমন একটি নীতির উপর ভিত্তি করে পথ চলছে, যেই নীতি থেকে তারা কখনোই সরে দাঁড়ায়নি। আবার কখনোই সেই নীতির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ পোষণ করেনি। তাদের কথা ও কাজে এক ও অভিন্ন। অবশেষে তিনি বলেছেন: আহলুল হাদীছের পরস্পরে ঐকমত্য হওয়ার কারণ হলো, তারা দীন গ্রহণ করেছে ক্বুর'আন ও সুন্নাহ থেকে যা তাদের মধ্যে একতা ও পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি করেছে। আর বিদ'আতীরা দীনকে গ্রহণ করেছে শুধুমাত্র 'আক্বলী দলীল ও মানবীয় সিদ্ধান্ত থেকে, যা তাদের মধ্যে মতানৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে।

শায়খুল ইসলাম (রহি) বলেছেন যেমনটি মাজমূ’ ফাতাওয়ায় (৪/৯১) বর্ণিত হয়েছে : এটা স্বীকৃত কথা যে, যে ব্যক্তি অনুসৃত ব্যক্তির কথা, তার সার্বিক অবস্থা, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও বাহ্যিক অবস্থা ভালোভাবে জানে, সেই উক্ত অনুসৃত ব্যক্তির ব্যপারে অধিকতম বিশেষজ্ঞ। আর এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, আহলুল হাদীছগণই আল্লাহর রসূল – ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর সাথে সম্পর্কিত ‘ইলমের ব্যাপারে পুরো মুসলিম উম্মাহ এর মধ্যে অধিক অবগত এবং তাঁর সহচরবৃন্দের ব্যাপারেও যেমন: খুলাফায়ে রাশিদীন ও আশারাতুল মুবাশশারাহ, উবাই বিন কা’ব, আব্দুল্লাহ

ইবনু মাস'ঊদ, মু'আয ইবনু জাবাল, আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম, সালমান আল-ফারিসী, আবূদ দারদা, উবাদাহ ইবনুছ্ ছামিত, আবূ যর আল-গিফারী, আম্মার ইবনু ইয়াসির, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, সা'আদ ইবনু মু'আয, সা'আদ ইবনু উবাদাহ, সালিম যিনি আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত দাস ও এই জাতীয় ব্যক্তিবর্গ, যারা রসূলের সর্বাধিক নিকটতম সঙ্গী ছিলেন এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন আর তাঁর সর্বোত্তম অনুসারী ছিলেন।

তিনি 'নাক্বদুল মানত্বিক্ব' কিতাবে (৪২ পৃষ্ঠা) বলেছেনঃ তুমি দেখবে কালাম শাস্ত্রের অনুসারীগণের মধ্যে একটি মতকে পরিত্যাগ করে অন্য মতকে গ্রহণ, কোনো ক্ষেত্রে একটি মতকে আঁকড়ে ধরা, আবার কোনো ক্ষেত্রে উক্ত মতের বিপরীত দিককে প্রাধান্য দিয়ে পূর্বের মতের প্রবক্তাকে কাফের বলার প্রবণতা অনেক বেশি। এটাই হলো ইয়াকীন বা দৃঢ়বিশ্বাস না থাকার দলীল, তবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল হাদীছ এর কোনো আলেমের ব্যাপারে, তাদের কোনো সাধারণ সৎ ব্যক্তির ব্যাপারে এটা জানা যায়নি যে, কখনো সে তার মত বা আক্বীদাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে। বরং তারা বিভিন্ন ফেতনা ও বিপদের সম্মুখীন হয়েও এই বিষয়ে সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। আর এটাই হলো নবীগণ, তাদের পূর্ববর্তী অনুসারীগণ, এই উম্মতের সালাফ, ছাহাবা ও তাবেঈন ও অন্যান্য ইমামগণ - এর অবস্থা। তবে প্রবৃত্তির চেতনার অনুসারীদের মধ্যে যে স্বীয় মতের উপর অবিচল থাকে, সে আসলে অবিচল থাকে তার মতের মধ্যে যে প্রকৃত সত্য বিদ্যমান থাকে সেই সত্যের কারণে। যেহেতু প্রতিটি এমন বিদ'আত, যার ভিত্তির উপর ভর করে বিরাট একদল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সেই বিদ'আত এর অনুসারীদের মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু হক্ব বিষয় যিন্দা আছে, যা রসূল — ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — নিয়ে এসেছেন এবং সেই বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতার আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল হাদীছ একমত, কেননা, শুধুই বাত্বিল এমন কোনো মত কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। মোট কথা হলোঃ আহলুল হাদীছ ওয়াস সুন্নাহ এর মধ্যে বিদ্যমান অবিচলতা ও স্থিরতা কালাম ও দর্শন শাস্ত্রের অনুসারীগণের অবিচলতা ও স্থিরতার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি পরিমাণে বিদ্যমান।

লাকনবী তার গ্রন্থ 'ইমামুল কালাম ফী মা য়াতা'আল্লাক্বু বিল ক্বিরা'আতি খালফাল ইমাম' গ্রন্থে (২২৮ পৃষ্ঠা) বলেছেনঃ আর যে ইনছাফের সাথে লক্ষ্য করবে এবং বিপথগামী না হয়ে ফিক্বহ ও উছূলের গভীর সমুদ্রে ডুব দিবে, সে সুনিশ্চিতরূপে জানতে পারবে যে, অধিকাংশ শাখাগত ও মৌলিক

মাসআলাসমূহ, যেগুলোর ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, সে সকল মাসআলায় মুহাদ্দিসদের মাযহাব অন্যান্যদের মাযহাব থেকে অত্যধিক শক্তিশালী। আমি যতবারই ইখতিলাফের শাখা-প্রশাখায় বিচরণ করেছি, ততবারই আমি মুহাদ্দিসদের মতকে ইনছাফের অধিক নিকটে পেয়েছি। আল্লাহই তাদেরকে এই সাফল্য দান করেছেন। কেন তিনি তা তাদেরকে দান করবেন না, অথচ তারা হলো নবীগণের প্রকৃত ওয়ারিস এবং তার শরী'আতের প্রকৃত প্রতিনিধি।

অধ্যায়ঃ ২

قواعد في القواعد

মূলনীতি গঠনের নীতিমালা

মূলনীতি বা ক্বায়দা-১ঃ মূলনীতি দলীল বিহীন প্রমাণিত হতে পারে না, বিধায় মূলনীতি গঠনে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দলীল উপস্থাপন করতে হবে। আর এমন মূলনীতি দ্বারা দলীল উপস্থাপন করা যাবে না, যেই মূলনীতি দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি।

শরী'আতের সকল বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাহই হলো একমাত্র মূলনীতি, এই দুটি উৎসই হলো সকল উছূল ও ক্বায়দাহ গঠনের মূল মাধ্যম। ক্বায়দাহ বা মূলনীতি চাই মৌলিক পর্যায়ের হোক অথবা ফিক্বহী পর্যায়ের হোক। কারণ, সর্বপ্রকার মূলনীতিই শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত। হ্যাঁ, তবে মূলনীতি বা ক্বায়দা গঠনের ভিত্তিগত দলীলটি পূর্ণ স্পষ্ট হওয়া জরূরী নয়। বরং মূলনীতি গঠনের ভিত্তিগত দলীলটি নুছূছ থেকে ও শরী'আতের বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা থেকে উদ্ঘাটিত হলেও তা ছহীহ হবে।

মাজমূ' ফাতাওয়ার (১০/২৬৩১) বর্ণনানুযায়ী শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়্যাহ বলেছেনঃ যে কিতাব, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত আছার এর ভিত্তিতে মৌলিক ও শাখা-প্রশাখাগত বিদ্যায় কোনো সিদ্ধান্ত গঠন করল, সে নবূওয়াতের রাস্তা অনুসরণ করল।

ইবনুল ক্বাইয়্যীম 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন' (২/৩৬৮) কিতাবে বলেছেন: যদি আমরা কোনো মূলনীতি গঠন করতে যেয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এটাই হলো মূলনীতি। এরপরে এই মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো সুন্নাহ পাওয়া গেলে তা যদি প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে আল্লাহর শপথ, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেই মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করেননি এমন হাজার মূলনীতির বিনাশ আমাদের জন্য অতীব জরূরী একটিমাত্র হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা থেকে।

ইবনু রজব হাম্বলী ফাদ্বলু 'ইলমিস সালাফ 'আলা 'ইলমিল খালাফ (১৫৭ পৃষ্ঠা) কিতাবে বলেছেন: এখান থেকে – অর্থ্যাৎ নব উদ্ভাবিত শাস্ত্রগুলো থেকে – আহলুর রায় ফক্বীহগণ যে সকল 'আক্বলী ক্বায়দা ও মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন, আর ফিক্বহী শাখাগত মাসআলাগুলোকে যেগুলোর আঙ্গিকে বিন্যস্ত করেছেন, চাই ফিক্বহি শাখাগত মাসআলা সুন্নাহ এর সাথে সাংঘর্ষিক হোক অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক, তারা এগুলো উদ্ভাবন করেছেন ঐ স্বীকৃত ক্বায়দা বা মূলনীতিগুলোকে অপসারণের লক্ষ্যে।

ক্বায়দা-২: ক্বায়দা বা মূলনীতির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন ছ্বহীহ না হলে তা মূল ক্বায়দা ছ্বহীহ না হওয়াকে আবশ্যক করে না।

কোনো ক্বায়দার সঙ্গে সংযুক্ত দৃষ্টান্ত ছ্বহীহ না হলে উক্ত ক্বায়দা ছ্বহীহ না হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ এমনটি বলা যাবে না যে, "নাহী বা নিষেধাজ্ঞা আমলের ফাসিদ বা বাতিল হওয়াকে নির্দেশ করে" ক্বায়দাটি ছ্বহীহ নয়। কারণ; এমন অনেক বিষয়কেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, যেগুলো ফাসিদ বা বাতিল হওয়াকে নির্দেশ করে না। অথবা এমনটি বলা যাবে না যে, "আমর বা আদেশ ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশ করে" এই ক্বায়দাটি ছ্বহীহ নয়। কারণ; এমন অনেক আমর বা আদেশ আছে, যেগুলো ওয়াজিব পর্যায়ের নয়। আর এমনটি বলা যাবে না এই জন্যে যে, এই দৃষ্টান্তগুলো উক্ত ক্বায়দার মূল ভিত্তি থেকে বের হয়ে গিয়েছে। তাই এমন দৃষ্টান্ত মূল ক্বায়দার মধ্যে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারবে না। আর এই হিসেবে ক্বায়দাটি মূলনীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যেমনটি পূর্ব থেকেই আছে এবং মূলনীতির উপর স্থির থাকে। আর উক্ত দৃষ্টান্ত ঐ ক্বায়দা থেকে বাদ পড়ে যাবে।

ক্বায়দা-৩ঃ সুন্নাহ ও জামা'আতকে আঁকড়ে ধরে রাখে এমন ক্বাওয়ায়েদ আল কুল্লীয়্যাহ বিবেচনায় রাখা ওয়াজিব।

শায়খুল ইসলাম তার 'মাজমূ' ফাতাওয়াতে (২২/৬৭) বলেছেনঃ যেহেতু সুন্নাহ দ্বারা নির্ণীত বিধান প্রত্যাখ্যান করা ও সুন্নাহ পরিত্যাগ করে অন্যকোনো উৎসকে আঁকড়ে ধরার পরিণতিতে সুন্নাহকে বিদ'আত, আর মুস্তাহাবকে ওয়াজিব এর রূপ দেওয়া হয়, যা বিভক্তি ও মতভেদে রূপান্তরিত হয়, যখন অন্যরা একই বিষয়টি ভিন্নভাবে সম্পাদন করে। তাই মুসলিমদের উপর এমন ক্বাওয়া'য়েদ আল কুল্লীয়্যাহ এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব, যেগুলোর মধ্যে সুন্নাহ ও জামা'আতকে আঁকড়ে ধরে রাখা যায়। মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক ছহীহ পথের পথিক হলো হাদীছবিশেষজ্ঞ আলেমগণ, যারা সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝে তা অনুসরণ করেছেন।

ফিক্বহ শাস্ত্রের এমন আলেমও আছেন, যারা ফিক্বহ শাস্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্বল হাদীছের উপরে নির্ভরশীল হয়েছেন। আবার অনেকের ভিত্তি ছিল ঐ আমল, যা তার শহরে বহুল প্রচলিত ছিল। ফলে তিনি মূল সুন্নাহকে সুন্নাহবিরোধী উক্ত আমলের চেয়েও নিম্নস্তরে নামিয়ে এনেছেন, এ কথা জানা থাকা সত্ত্বেও যে, নবী — ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — এই বিষয়ে উদারতা পোষণ করেছেন আর এগুলোর প্রত্যেকটিই সুন্নাহ।

ক্বায়দা-৪ঃ খাছ্ব (নির্দিষ্ট) দলীল 'আম বা সাধারণ ক্বায়দার উপরে প্রাধান্য পাবে।

যখন কোনো মাসআলায় উক্ত মাসআলার সঙ্গে সরাসরি জড়িত কোনো বিশেষ দলীল পাওয়া যাবে, তখন সাধারণ ক্বায়দার দিকে লক্ষ্য করা হবে না। সাধারণ ক্বায়দার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে একমাত্র তখন, যখন সংশ্লিষ্ট মাসআলায় কোনো নছ্ব না থাকবে। উদাহরণস্বরূপ কোনো মাসআলায় নির্দিষ্টভাবে উক্ত মাসআলার সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত কোনো দলীল বিদ্যমান থাকলে সাধারণ কল্যাণ বা অন্যায়ের আলোকে উক্ত মাসআলার কোনো সমাধান নির্ণয় করা যাবে না। যেমনটি ইবনু রজব ফাতহুল বারীতে (২/৮৪) সরাসরি নির্দিষ্ট দলীলের সঙ্গে সংযুক্ত মাসআলার ব্যাপারে বলেছেনঃ নুছূছ্ব (কিতাব অথবা সুন্নাহ এর কোনো স্পষ্ট দলীল) অযুহাত ও যুক্তির দাবি দ্বারা কখনো প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

ক্বায়দা-৫ঃ কোনো কোনো শাখাগত মাসআলায় আলেমগণের মতানৈক্য হওয়া, মৌলিক ক্বায়দার মধ্যে মতানৈক্য হওয়া নয়।

কোনো একটি ক্বায়দার অধীন একাধিক মাসআলায় আলেমগণের মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়াটা উক্ত মূল ক্বায়দার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়াকে আবশ্যক করে না। কখনো তারা একটি ক্বায়দার মধ্যে একমত হয়েও উক্ত ক্বায়দার অধীন কোনো পৃথক মাসআলায় মতভেদ করতে পারেন। উদাহরণঃ কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা নিষিদ্ধ হওয়ার মাসআলা ।

শায়খুল ইসলাম ইক্বতিদ্বাউছ্ছ ছিরাত্বিল মুস্তাক্বীম গ্রন্থে (১৪১ নং পৃষ্ঠা) বলেছেনঃ আমাদের পূর্ব বর্ণিত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, সকল ইমাম এই ব্যাপারে একমত যে, সামগ্রিকভাবে আহলুল কিতাব ও অনারবীয় (অমুসলিম) জাতির সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন করা নিষিদ্ধ, যদিও তারা কোনো কোনো শাখাগত মাসআলায় মতানৈক্য করেছেন। হয়ত তাদের মতে সংশ্লিষ্ট আচার বা রীতি কাফেরদের স্বভাব-আচারের অন্তর্ভুক্ত নয়, অথবা হয়ত তাদের মতে “সংশ্লিষ্ট আচার বা রীতি কাফেরদের স্বভাব-আচারের অন্তর্ভুক্ত নয়” এই মতের দলীল অধিক শক্তিশালী, যা অগ্রগণ্য, অথবা অন্যকোনো কারণে। যেমনিভাবে তারা কিতাব ও সুন্নাহ এর অনুসরণের উপর সকলেই একমত, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা তা’বীল এর আলোকে একে অপরের সঙ্গে মতানৈক করে থাকেন, আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ক্বায়দা-৬ঃ উছূলুল ফিক্বহ শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় এমন যেকোনো ক্বায়দার আলোকে যদি কোনো শাখাগত ফিক্বহী মাসআলা উদ্ভাবন না করা হয় অথবা যে ক্বায়দার মধ্যে মতানৈক্য হওয়ার দ্বারা কোনো শাখাগত ফিক্বহী মাসআলায় মতানৈক্য হয় না তাহলে আলোচিত এমন যেকোনো ক্বায়দা উছূলুল ফিক্বহ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সর্বপ্রথম যিনি উছূলুল ফিক্বহ শাস্ত্রটি সংকলন করেছেন, তিনি হলেন ইমাম শাফেঈ। তিনি স্বীয় গ্রন্থ ‘আর রিসালাহ’ এর মধ্যে এই শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই কিতাবটি সর্বাধিক উপকারী ও শ্রেষ্ঠতম কিতাবগুলোর মধ্যে অন্যতম। তিনি এই কিতাবটি শারঈ দলীল ও সালাফদের আছারসমূহের ভিত্তিতে রচনা করেছেন। এরপরে আরো অনেক গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। তবে যেহেতু অধিকাংশ উছূলী কিতাবগুলো আশ’আরী অথবা মু’তাযিলী সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ রচনা করছিলেন, তাই সেই কিতাবগুলোর বিষয়বস্তু উছূলুল ফিক্বহ শাস্ত্রকে বিনাশ করে দিচ্ছিল।

তারা এই উছূলুল ফিক্বহ শাস্ত্রে ‘ইলমুল কালাম তথা তর্ক শাস্ত্র, অনর্থক মাসআলাসমূহ ও উছূলুল ফিক্বহ এর সঙ্গে সম্পর্কহীন অপ্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটাল। তারা বাক্য ও বর্ণনাভঙ্গিকে জটিল ও দুর্বোদ্ধ করে তুলল এবং ভাষাকেই বিশ্লেষণের মূল মানদণ্ড নির্ধারণ করল। ফলে তারা ভাষাকে কিতাব, সুন্নাহ ও সালাফগণের আছারসমূহের উপর অগ্রাধিকার দিতে লাগল। এই জাতীয় জটিল ও দুর্বোদ্ধ বিষয়গুলো উছূলুল ফিক্বহ এর মাসআলাগুলোতে অনুপ্রবেশের ফলে মানুষ উছূলুল ফিক্বহ অধ্যয়ন থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতে লাগল।

আল্লামা ত্বাহির আল-জাযায়িরী ‘তাওজীহুন নাযযার ইলা উছূলিল আছার’ গ্রন্থে (২৩৭ পৃষ্ঠা) বলেছেন: উছূলুল ফিক্বহ শাস্ত্রে এমন অনেক মাসআলার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যেগুলো একান্তই কল্পনাপ্রসূত। অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয়েছে (বাস্তবে এমন মাসআলা আদৌ কোথাও দেখা যায়নি) এমন মাসআলা, যেগুলো এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। যার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এমন মাসআলা সজাগ মস্তিষ্কের অধ্যয়নকারীর মনে দুশ্চিন্তার জন্ম দিয়েছে। যখন সে এ জাতীয় মাসআলাগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করতে চায়, অনেক কষ্ট-ক্লেশ এর পরেও তার মস্তিষ্ক পূর্বের স্থানেই ফিরে আসে, একটি দৃষ্টান্তও উপস্থাপনে সক্ষম হয় না। সুতরাং এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে সজাগ থাকা দরকার। পাশাপাশি ঐ বিষয়ের উপরেও সজাগ থাকা দরকার, যা অনেক আলেম বর্ণনা করেছেন যে, উছূলুল ফিক্বহ শাস্ত্রে আলোচিত প্রত্যেক এমন মাসআলা, যার উপর ভিত্তি করে কোনো শাখাগত ফিক্বহী মাসআলা অথবা শারঈ আদব বা ভদ্রতা সংক্রান্ত কোনো মাসআলা উদ্ভাবিত হয়নি, অথবা যে মাসআলা কোনো শারঈ বিধান প্রনয়ণের ক্ষেত্রেও কোনো প্রকার সহযোগী নয়, সেই মাসআলা উছূলুল ফিক্বহ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এই শাস্ত্রটি ফিক্বহ শাস্ত্রের জন্য অর্থবহ না হলে এবং ফিক্বহ শাস্ত্রের ইজতিহাদকে বাস্তবতায় রূপান্তর না করলে এই শাস্ত্রটি একটি অনর্থক আলোচনা ছাড়া আর কী? তাই যখন এই শাস্ত্রটি ফিক্বহ শাস্ত্রের জন্য অর্থপূর্ণ না হবে, তখন এটা আর ফিক্বহ শাস্ত্রের মূলভিত্তি বলে বিবেচিত হবে না।

এই নিয়মটি নতুন করে এমন অনেক মাসআলার ব্যাপারে বিবেচনার দাবি রাখে, যে মাসআলাগুলোর ব্যাপারে পরবর্তী সারির আলেমগণ নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। আর সেই মাসআলাগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন তারা এই শাস্ত্রে। যেমন, পরিভাষা গঠনের সূচনা সংক্রান্ত মাসআলাসমূহ, ইবাহাহ এর মাসআলা, এটা দায়িত্ব কি না? অস্তিত্বহীন বস্তুর ব্যাপারে আদেশ সংক্রান্ত মাসআলা, এমনিভাবে প্রত্যেক এমন

মাসআলা, যার উপর ভিত্তি করে ফিক্বহী কোনো মাসআলা উদ্ভাবিত হলেও এমন মাসআলায় মতানৈক্য সৃষ্টি হলে ফিক্বহ শাস্ত্রের কোনো শাখাগত মাসআলায় তার প্রভাব পড়ে না। যেমন, অনেকগুলো নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে কোনো একটি অনির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে আদেশ করা যেমন শপথ ভঙ্গের কাফফারার ক্ষেত্রে। কেউ কেউ বলেছেন: এমন অনির্দিষ্ট বিষয়ে আদেশ করলে যেকোনো একটি বিষয় অনির্দিষ্টভাবে পালন করা ওয়াজিব হয় (অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে কোনো একটি পালন করা ওয়াজিব হয় না)। আবার কেউ কেউ বলেছেন: এমন আদেশ প্রাথমিকভাবে সবগুলো বিষয়কেই পালন করা ওয়াজিব করে। তবে যেকোনো একটি পালন করার দ্বারা অন্য সবগুলো থেকে দায়ভার মুক্ত হয়ে যায়। আবার অনেকে বলেছেন: এমন আদেশ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যা নিজের জন্য পছন্দ করবে, তাই ওয়াজিব করে। যদি সে সবগুলো পালন করে, তাহলে বলা হয়: তার জন্য ওয়াজিব হলো সর্বোচ্চ কঠিন বিষয়টি। আর যদি সে এমন আদেশ পালন না করে, তাহলে বলা হয়: তাকে সর্বনিম্ন বিষয়টি পালন না করার শাস্তি দেওয়া হবে। এই জাতীয় সকল অনর্থক মাসআলা, যেগুলো তারা ফিক্বহ শাস্ত্রে উদ্ভাবন করেছে, সেই মাসআলাগুলোর সাথে উছূলুল ফিক্বহ এর কোনো সম্পর্ক নেই।

ইমাম শাওকানী 'মুন্তাহাল আরাব ফী আদাবিত্ব ত্বলাব' গ্রন্থে (১৭৪ পৃষ্ঠা) বলেছেন: সম্পূর্ণ একটি মানবীয় মস্তিষ্ক প্রসূত বিষয়কে ইজতিহাদ এর উপকরণ এর সাথে সরাসরি জড়িত কোনো গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র মনে করার কারণেই একপেশে পক্ষপাতিত্বে সংক্রমিত ব্যক্তি ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রেই এ বিষয়টি উছূলুল ফিক্বহ এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেখানে মা'রূফ মুনকার এর সাথে, ছ্বহীহ ফাসিদ এর সাথে আর উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। কখনো কখনো এই শাস্ত্রের আলেম কোনো একটি যৌক্তিক মাসআলা নিয়ে আলোচনা করে এবং সেই যৌক্তিক মাসআলাটিকে বিধিবদ্ধ ও স্বীকৃত মূলনীতি হিসেবে ধার্য করে দেয়। অথচ উক্ত মাসআলাটির সাথে এই শাস্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই এবং কোনো দিক থেকেই এই শাস্ত্রের সাথে তা জড়িত নয়। ফলে এই শাস্ত্রের ছাত্র যখন তা অধ্যয়ন করতে বসে, সে বিশ্বাস করতে থাকে যে, উক্ত আলোচিত মাসআলাটি এই শাস্ত্রের একটি অংশ। তাই সে শাখাগত মাসআলাগুলোর সমাধানের ক্ষেত্রেও উক্ত মাসআলার দিকে ঝুকে পড়ে। আর দলীল প্রমাণ এর মধ্যে পারস্পারিক অসঙ্গতি ও বিরোধিতা দেখা দিলেও সে ঐ মাসআলার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। একই মাসআলাকে সে অনেক আলোচনা সমালোচনার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে। 'উক্ত মাসআলাটি উছূলুল

ফিক্বহ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত’ এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে এমনটি করতে থাকে। অথচ এই মাসআলাটি একটি যৌক্তিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তা সে জানেই না। যদি সে জানত, তাহলে সে তাতে পতিত হত না এবং সেই দিকে ধাবিতও হতো না। তাই এই জাতীয় ছাত্ররা একপেশে পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়ে নিরপেক্ষতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর সে যৌক্তিক গবেষণার পথে অগ্রসর হতে থাকে নিজের অজান্তে অসাবধানতাবশত। কিন্তু মনে মনে এই বিশ্বাস পোষণ করতে থাকে যে, তারা সত্যকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, অবিচলতার সঙ্গে দলীলকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, ইনছাফ এর উপরে দাঁড়িয়ে আছে, পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে। খুব কম ছাত্রই এই সূক্ষ্ম সমস্যাকে স্বীকার করে এই উর্ধ্বমুখী ধুলি-ঝড়ের থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে। বরং তারা সংখ্যায় অল্পসংখ্যাক এর চেয়েও অনেক অল্প। এটা নিরপেক্ষ ও ইজতিহাদ এর যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য যেমনি ভয়ঙ্কর, তেমনি ক্ষতিকারক, তেমনি প্রভাবক, তেমনি সমস্যার সংঘটক, তেমনি দ্রুতবেগে কপটতার মনোভাব বৃদ্ধিকারক।

তুমি যদি প্রশ্ন কর: আপনার ধারণানুযায়ী বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক দুর্বোধ্যতা ও সূক্ষ্মতাই যদি এর কারণ হয়, যেই ফাঁদে বহু লেখক নিজের অজান্তেই পা দিয়েছেন, তাহলে এমন পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সমাধান কী হতে পারে? যাতে করে এই বিপদে পতিত ব্যক্তি তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে।

আমি বলব: জেনে রাখো, উছূলুল ফিক্বহ শাস্ত্রের যে বিষয়টি আরবী ভাষার সাথে সরাসরি স্পষ্টরূপে সম্পর্কযুক্ত, যেমন, ‘আমকে খাছ্ব এর স্থলে রেখে ব্যাখ্যা করা, মুত্বলাক্ব এর উপর মুক্বাইয়্যাদ এর বিধান আরোপ করা, মুজমালকে মুবাইয়্যান এর অন্তর্ভুক্ত করা এবং আমর ও নাহী এর দাবিসহ এ জাতীয় বিষয়ে মুজতাহিদ এর উপরে ওয়াজিব হলো আরবী শব্দগুলোর প্রয়োগ স্থলসমূহ ও আরবী ভাষা-ভাষীদের বাক্যের উৎপত্তিস্থল এবং তারা সংশ্লিষ্ট পরিভাষা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করত তা বিশ্লেষণ করে দেখা। এরপরে যা ফলাফল আসে, তাই হবে গ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাবর্তনস্থল। যখন উছূল শাস্ত্রবিদগণ এ জাতীয় কোনো বিষয়ে মতানৈক্য করবে, তখন যে আরবী ভাষার ব্যাপারে যত প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী, তার কাছেই হক্ব থাকার সম্ভাবনা বেশি। এটা হলো ঐ ক্ষেত্রে যখন, এই বিষয়ে কোনো শারঈ দলীল না থাকবে। আর যদি শারঈ দলীল থাকে, তাহলে তা অন্য সবকিছুর ওপর অগ্রগণ্য হবে। আর যদি তুমি আরো অধিক স্পষ্ট ব্যাখ্যাসহকারে দৃষ্টান্ত ও চিত্রায়নসহ জানতে চাও, তাহলে জেনে রাখো, এই বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি

হয়েছে যে, 'আমকে খাছ্ব এর স্থলে রেখে সাধারণভাবে সর্বক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা যাবে নাকি খাছ্ব 'আমের পরে অস্তিত্বে আসার শর্তে 'আমকে খাছ্ব এর স্থলে রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে? আর এই বিষয়েও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে যে, মুত্বলাক্বের উপরে মুক্বাইয়্যাদ এর বিধান আরোপ করার জন্য উভয়টির কার্যকারণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়া শর্ত নাকি উভয়টির কারণ এক হলেও চলবে? আর এই বিষয়েও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে যে, আমর এর প্রকৃত অর্থ কী, আমর বা আদেশ কি আদিষ্ট কাজ সম্পন্ন করাকে ওয়াজিব করে নাকি করে না? এমনিভাবে নাহীর প্রকৃত অর্থের মধ্যেও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে যে, নাহী বা নিষেধ এর দ্বারা নিষিদ্ধ বস্তু কি হারাম এর পর্যায়ের নিষিদ্ধ নাকি অন্যকোনো পর্যায়ের। সুতরাং যখন তুমি এই জাতীয় বিষয়ে ভালোভাবে অবহিত হতে চাও, তখন আরবী ভাষার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করো। আর ভাষার মধ্যে গবেষণা হতে নিসৃত ফলাফলের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, যেই ফলাফল ভাষাভাষীদের মতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আর ভাষাভাষীদের মত বিরোধী হলে তা পরিহার করো। আর যদি তুমি দেখতে পাও যে, উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি নির্দেশক শারঈ দলীলও আছে, যেমনটি তুমি অচিরেই দেখতে পাবে "শারঈ দলীলসমূহের আলোচনায়" অর্থাৎ আমর আদিষ্ট বিষয়টি ওয়াজিব হওয়াকে বুঝায়, আর নাহী নিষিদ্ধ বিষয়টি হারাম হওয়াকে বুঝায়।

সুতরাং মাসআলাটি মৌলিক পর্যায়ের। কারণ, এটি একটি শারঈ ক্বায়দাতুল কুল্লীয়্যাহ। যেহেতু এই ক্বায়দার দলীলও শারঈ দলীল ঠিক যেমনিভাবে ভাষা থেকে উদ্ভাবিত কোনো ক্বায়দাতুল কুল্লীয়্যাহ মৌলিক আভিধানিক মাসআলা। তাই এ জাতীয় সকল মাসআলা যেমন, মাসা'য়িলুন নাসখ, মাসায়িলুল মাফহূম ওয়াল মানত্বূক্ব, যেগুলো আরবী ভাষার সাথে সম্পৃক্ত, আরবী ভাষা থেকে এমনভাবে উদ্ভাবিত যে, এটা একটি ক্বায়দাতুল কুল্লীয়্যাহ এর রূপে রূপান্তরিত হয়েছে, যা মৌলিক মাসআলাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর এই ক্বায়দাতুল কুল্লীয়্যাহ এর উৎস হলো ঐ শাস্ত্র, যা দ্বারা কোন ক্বায়দা অগ্রগণ্য আর কোন ক্বায়দা অনুপযুক্ত তা জানা যাবে, সেই শাস্ত্র থেকেই এই ক্বায়দাতুল কুল্লীয়্যাহ উদ্ভাবন করা হয়েছে। আর ক্বিয়াস এর আলোচনার ক্ষেত্রে এই কথা বলা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্বিয়াসটা শুধুমাত্র যৌক্তিকতা দ্বারা ঢাকা থাকে, যা প্রমাণের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো কিছুর সাথেই সম্পৃক্ত থাকে না। এর দৃষ্টান্ত হলো উছূলবিদ আলেমগণ কারণ (কোনো বিধান কার্যকর হওয়ার পেছনে বিদ্যমান উপযুক্ত কারণ) নির্ণয় ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে দশটি মত ও পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন, যেগুলোর

কোনোটিই উপযুক্ত দলীলের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। তবে যেটি শারঈ দলীলের সঙ্গে সংযুক্ত, সেটির কথা ভিন্ন, যেমন: কিতাবুল্লাহ অথবা সুন্নাহ এর নছ্ব এর মধ্যে সরাসরি কারণ এর উপরে স্পষ্টরূপে আলোকপাত করা হয়েছে এমন কারণ, অথবা আরবী ভাষা থেকে জানা যায় এমন কোনো কারণ। যেমন: "দুইটি বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান অমিলকে অকার্যকর সাব্যস্ত করে উভয়টিকে একই বিধানের আওতাধীন করে দেওয়া" এই মত অনুসারে ইলহাক্ব এর কারণ নির্ণয় করা, এমনিভাবে কোনো বিধানের সঙ্গে উল্লিখিত কর্মটির চেয়ে অনুল্লিখিত কোনো কর্মের ক্ষেত্রে যদি উক্ত বিধানটি অধিকমাত্রায় প্রজোয্য হওয়ার উপযুক্ত সাব্যস্ত হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে অনুল্লিখিত কর্মটির ক্ষেত্রেও একই বিধান সাব্যস্ত করা হয় উল্লিখিত কর্মের উপরে অনুল্লিখিত কর্মটিকে ক্বিয়াস করে। আর এই অনুল্লিখিত কর্মটি যেহেতু বাচনিক ভঙ্গি থেকেই বুঝে আসে, তাই এই অনুল্লিখিত কর্মটিকে ফাহওয়াল খিত্বাব বা বাক্যের অনুল্লিখিত তাৎপর্য বা ইঙ্গিতমূলক তাৎপর্য বলা হয়। আর যেসকল বিষয় উছূল শাস্ত্রবিদগণ মাক্বাছেদ এর আলোচনায় বর্ণনা করেছেন, যেমনটি তারা মাক্বছাদুল কিতাব, মাক্বছাদুস সুন্নাহ ও ইজমা' এর ক্ষেত্রে আলোচনা করেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো: তাদের সম্পূর্ন বিশ্লেষণের মধ্যে যেই আলোচনা শারঈ দলীল থেকে গৃহীত হবে, তা মৌলিক শারঈ বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর যেই আলোচনা অভিধানের উৎস থেকে নিঃসৃত হবে, তা মৌলিক আভিধানিক বিধান বলে বিবেচিত হবে, আর যেই আলোচনা উভয়টির কোনোটি থেকেই হবে না, তা যৌক্তিক 'ইলমের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা থেকে সাবধান থাকার কথা কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা তোমাকে বলেছিলাম। আর উছূলুল ফিক্বহ শাস্ত্রের কিতাবগুলোতে যে সকল মাক্বাছেদ নিয়ে আলোচনা করা হয়, সেগুলোর মধ্যে একান্তই রায় বা যুক্তি নির্ভর অন্যতম পরিভাষাগুলো হলো: ইস্তিহসান, ইস্তিছ্বহাব ও তালাঝুম।

আর ইজতিহাদ, তাক্বলীদ, আমাদের পূর্ববর্তী শরী'আতসমূহের বিধান সম্পর্কিত আলোচনা ও ছাবাগণের সাধারণ মত বা কথার শারঈ মান সম্পর্কিত আলোচনাসমূহের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, এগুলো শারঈ মাসআলার অন্তর্ভুক্ত। তাই যেই মাসআলায় দলীল থাকবে, তা হক্ব ও গ্রহণযোগ্য। আর যেই মাসআলা শারঈ দলীলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তা বাত্বিল বলে বিবেচিত হবে। আর তারজীহ (দুইটি দলীলের যেকোনো একটিকে অগ্রাধিকার প্রদান) এর মাসআলায় দৃষ্টিপাত করতে হবে মুরাজ্জিহ তথা অগ্রাধিকার প্রদানকারী ক্বায়দা বা মূলনীতির প্রতি। যদি ক্বায়দাটি শারঈ দলীল থেকে গঠিত হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত ক্বায়দাটিও শারঈ ক্বায়দা বলে

বিবেচিত হবে, আর যদি ক্বায়দাটি কোনো মানব সংকলিত শাস্ত্রের আলোকে গঠিত হয়ে থাকে, তাহলে সেই শাস্ত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। যদি তারজীহ তথা অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত শাস্ত্রটির প্রবেশাধিকার থাকে, যেমন অভিধান শাস্ত্র, তাহলে এই অগ্রাধিকার গ্রহণযোগ্য। আর যদি শুধুমাত্র মৌখিক দাবি ছাড়া উক্ত শাস্ত্রটির আর কোনো প্রবেশাধিকার না থাকে, তাহলে উক্ত শাস্ত্রটির মাধ্যমে প্রদানকৃত অগ্রাধিকার অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

অধ্যায়ঃ ৩

قواعد في أهل الحديث

আহলুল হাদীছদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নীতিমালা।

ক্বায়দা-১ঃ আহলুল হাদীছ এর মূলনীতিসমূহ অন্যদের মূলনীতির চেয়ে অধিক ছ্বহীহ। আর তাদের ত্বরীক্বা অন্যদের ত্বরীক্বার চেয়ে অধিক ছ্বহীহ।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া মাজমূ' ফাতাওয়ায় (৩/৩৪৬) বলেছেনঃ নাজাতপ্রাপ্ত দল (ফিরকাতুন নাজিয়া) হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত হলোঃ আহলুল হাদীছ ওয়াসসুন্নাহ, যাদের একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ আল্লাহর রসূল — ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা রসূলের কথা ও যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, ছ্বহীহ ও যঈফ হাদীছের মধ্যে সর্বোত্তম পার্থক্য নিরূপণকারী, তাদের ইমামগণ হাদীছ শাস্ত্রে বিজ্ঞ আলেম, এই শাস্ত্রের তথ্যসমূহের ব্যাপারে তারা পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ, তারা রসূলের যাবতীয় কথা ও কাজ অনুকরণ করা, সত্যায়ন করা, আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা ও মন থেকে পছন্দ করার দিক থেকে অতীব আগ্রহী। যারা রসূলের কথা ও কাজকে ভালোবাসে, তারাও তাদেরকে ভালোবাসে, যারা রসূলের কথা ও কাজকে অপছন্দ করে, তারাও তাদেরকে অপছন্দ করে। তারা সর্ব প্রকার বক্তব্য ও উদ্ধৃতি আল্লাহর কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে বিচার করে, যার ফলে তারা নিজের পক্ষ থেকে এমন কোনো বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করে সেটাকে দীনের মূলনীতি বানিয়ে নেয় না, যা ছ্বহীহ সূত্রে

প্রমাণিত নয়। বরং রসূলকে যেই কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে পাঠান হয়েছে সেটাকেই নিজেদের মূলনীতি বানিয়ে নেয়, আর সেটাকে তারা মন থেকে বিশ্বাস করে এবং তার উপর পূর্ণ আস্থা রাখে।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া মাজমূ' ফাতাওয়ায় (৩৪/১১৩) আরো বলেছেন: ইমাম আহমাদ এর সাথে ইমাম শাফেঈ ও ইসহাক্ব এর মতের মিল এত বেশি, যা ইমাম আহমাদের সাথে অন্যান্য ইমামদের নেই। একইভাবে তার মূলনীতিগুলোর সঙ্গে ইমাম শাফেঈ ও ইসহাক্ব এর মূলনীতিগুলোর এত বেশি মিল, যা তার সাথে অন্যান্য ইমামদের নেই। তিনি তাদের উভয়ের খুব প্রশংসা করতেন, তাদের উভয়কে শ্রদ্ধা করতেন, যাদের মাযহাবের মূলনীতিগুলো শাফেঈ ও ইসহাক্বের মাযহাবের মূলনীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় তাদের মূলনীতিগুলোর উপরে তিনি শাফেঈ ও ইসহাক্বের মূলনীতিগুলোকে প্রাধান্য দিতেন, তার মযহাব মতে হাদীছ শাস্ত্রের ফক্বীহগণের মূলনীতিগুলো অন্যদের মূলনীতির চেয়ে অধিক সঠিক। আর শাফেঈ ও ইসহাক্ব হলেন তার নিকটে হাদীছ শাস্ত্রের সর্বোচ্চ ফক্বীহদের মধ্যে অন্যতম, আর তাদের উভয়ের মূলনীতিগুলো অন্যদের মূলনীতির চেয়ে অধিক ছ্বহীহ। আর তার মতে শাফেঈ ও ইসহাক্ব তারা উভয়েই যার যার যুগের সর্বোচ্চস্তরের হাদীছ শাস্ত্রের পণ্ডিত।

মাজমূ' ফাতাওয়ায় (৪/১৪০) শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়্যাহ আরো বলেছেন: এখানে ঐ ব্যক্তিকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য, যে তার পরিস্থিতির ভাষা অথবা মুখের বাণী থেকে এই মর্ম উপলব্ধি করেছে যে, "অভ্যন্তরীণ গায়েবী বিষয়ের প্রকৃত অবস্থাসমূহ; যেমন- সৃষ্টি, পুনরুত্থান, সৃষ্টিজগতের সূচনা, পরকালের বিচার, আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনা ও ঐ সকল চরিত্র, যেগুলো দ্বারা আত্মা পরিশোধিত হয়, সৎকাজের উপযুক্ত হয় ও পূর্ণতা লাভ করে এই জাতীয় বিষয়গুলো আহলুল হাদীছ ছাড়া অন্যকোনো দল বেশি জানে", তাহলে সে রসূলগণের প্রতি ঈমানদার হলেও জাহিল, তার মধ্যে আংশিক নিফাক্ব এর অস্তিত্ব আছে।

ক্বায়দা-২: "সালাফ আছ্ব-ছ্বলেহীন এর উপলব্ধির আলোকে আল্লাহর কিতাব ও ছ্বহীহ হাদীছের অনুসরণ করা" আহলুল হাদীছ এই সাধারণ মূলনীতির আলোকে পথ চলে।

মুখতাছ্বারু ছ্বাওয়াইক্বিল মুরসালাহ কিতাবে (২/৩৩৫) ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আমাদের মতে সুন্নাহ অনুসরণের মূলনীতি হলো

আল্লাহর রসূল — ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — এর ছাহাবাদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়্যাহ মাজমূ' ফাতাওয়ায় (৩/৩৭৮) বলেছেন: যেই সুন্নাহ অনুসরণ করা ওয়াজিব, যার অনুসারীগণ প্রশংসিত হওয়ার যোগ্য আর যার বিরোধিতাকারিগণ নিন্দিত হওয়ার যোগ্য তা হলো: আক্বীদাহ ও ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয় ও দীনের সকল বিষয়ে রসূলুল্লাহ — ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — এর সুন্নাহ বা আদর্শ। আর এটা জানা যাবে নবী — ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — এর থেকে বর্ণিত হাদীছসমূহ যেখানে তাঁর কথা, কাজের বর্ণনা, তিনি যে সকল কথা ও কাজ পরিত্যাগ করেছেন তার বর্ণনা দ্বারা। আর ছাহাবাগণের আদর্শ এবং সঠিকভাবে যারা সাহাবাদের অনুসরণ করেছেন তাদের আদর্শের মাধ্যমে।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়্যাহ একই কিতাবে (৪/৯৫) আরো বলেছেন: আমরা আহলুল হাদীছ বলতে শুধুমাত্র হাদীছের শ্রোতা অথবা হাদীছের সংকলক অথবা হাদীছের বর্ণনাকারীকেই নয়, বরং প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকেই আমরা আহলুল হাদীছ মনে করি, যে হাদীছ সংরক্ষণ, হাদীছ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, হাদীছকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপলব্ধিকরণ ও হাদীছের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে অনুসরণ করে।

আমি বলব: শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়্যাহ এর এই কথার অর্থ হলো কোনো ব্যক্তিকে আহলুল হাদীছ হওয়ার জন্য অমুকের কিতাব অধ্যয়ন করা অথবা অমুকের কিতাব পাঠ করা অথবা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে অমুকের (হাদীছ বর্ণনার যোগ্যতার) ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা অথবা অমুক বিদ'আতের অনুসারী কি না এই বিষয়টি জানা থাকা ইত্যাদি বিষয়গুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। বরং যে ব্যক্তি নবী — ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — এর হাদীছের উপরে আমল করে ও তা অনুসরণ করে, সেই আহলুল হাদীছের অন্তর্ভুক্ত।

ক্বায়দা-৩: নিজেকে আহলুল হাদীছের দিকে সম্বন্ধ করে এমন কেউ তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাদের পথে চলে।

এখানে বিবেচনার বিষয়টি হলো আহলুল হাদীছের পথ ও পদ্ধতি। সুতরাং যে মুখের ভাষায় বলবে: আমি আহলুল হাদীছের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে হাদীছ

অধ্যয়ন করে থাকে, তথাপি সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাদের পথ ও পদ্ধতির অনুসরণ না করে। কারণ, এই ক্ষেত্রে মূল বিবেচনার বিষয়টি হলো কর্মপদ্ধতির ভাষা, মুখের ভাষা নয়।

খত্বীব আল বাগদাদী শারাফু আছ্বহাবিল হাদীছ গ্রন্থে (৯ পৃষ্ঠা) আহলুল হাদীছের প্রশংসা করার পরে বলেন: প্রত্যেক বিদ'আতের অনুসারী প্রকাশ্যে তাদের আক্বীদাকেই জাহির করে, সে তাদের মাযহাব ছাড়া অন্যকোনো মাযহাব এর মতাদর্শের কথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করার দুঃসাহসিকতা দেখায় না।

ক্বায়দা-৪: আহলুল হাদীছের মানহাজ (কর্মপদ্ধতি) মৌলিক ক্বায়দা ও মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল, মাসায়েলের উপর নয়।

কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট কিছু মাসআলা মেনে আমল করলেই আহলুল হাদীছ হয়ে যায় না অথবা নির্দিষ্ট কিছু মাসআলা পরিত্যাগ করলেই আহলুল হাদীছ হওয়া থেকে বহির্ভূত হয়ে যায় না। বরং এই ক্ষেত্রে মূল মানদণ্ড হলো আহলুল হাদীছের মূলনীতীসমূহ এবং সেগুলোর প্রতি আমল করা। সুতরাং যে আহলুল হাদীছের মূলনীতি অনুযায়ী আমল করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে আহলুল হাদীছের মূলনীতি অনুযায়ী আমল করবে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও সে কিছু কিছু মাসআলায় তাদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে।

ক্বায়দা-৫: যে একটি ক্বায়দাতেও আহলুল হাদীছের সঙ্গে মতানৈক্য পোষণ করে, সে আহলুল হাদীছের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত নয়।

শাত্বিবী আল 'ইতিছ্বাম গ্রন্থে (৩/১৭৭) বলেছেন: এর কারণ হলো এই ফিরক্বাগুলো (বিচ্ছিন্ন দলগুলো) বিচ্ছিন্ন হয়েছে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের সঙ্গে কোনো আংশিক ক্ষেত্রে নয়, বরং দীনের সার্বিক ক্ষেত্রে ও শরী'আহ এর মৌলিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মতভেদে লিপ্ত হওয়ার কারণে। যেহেতু আংশিক নীতি প্রণয়ন বা সামান্য কিছু শাখাগত মাসআলায় এমন কোনো মতানৈক্য সৃষ্টি হতে পারে না, যার পরিণতিতে দলে দলে বিভক্ত হওয়ার ন্যায় পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, বরং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে তখনই, যখন মতবিরোধ সার্বিক ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, আর ক্বায়দাতুল কুল্লীয়্যাহ এর পিঠে ভর করে প্রচুর পরিমাণে আংশিক মাসআলা গঠিত হয়। কারণ, বিদ'আতী

ব্যক্তি যখন প্রচুর পরিমাণে শাখাগত নতুন মাসআলা নিজের পক্ষ থেকে উদ্ভাবন করে, তখন এই ধরনের বিদ'আতের উদ্ভাবন শরী'আহ এর অনেকগুলো নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে, ঠিক যেভাবে ক্বায়দাতুল কুল্লীয়্যাহ সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়।

ক্বায়দা-৬: যারা আহলুল হাদীছের মতের বিরোধিতা করে তাদের সঙ্গে আহলুল হাদীছ ন্যায় ও ইনছাফ বজায় রাখে।

শায়খুল ইসলাম মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে (৫/ ১৫৬) বলেছেন: আহলুস সুন্নাহ তাদের সঙ্গে ন্যায় ও ইনছাফ বজায় রেখে চলে তাদের প্রতি কোনো ধরনের অন্যায় আচরণ করে না। কেননা, অন্যায় আচরণ সর্বক্ষেত্রে হারাম। বরং আহলুস সুন্নাহ প্রত্যেক দলের সঙ্গে তাদের এত ভালো আচরণ করে, যা উক্ত দলের সদস্যরাও তাদের সঙ্গে করে না। বরং তারা হলো রাফেযীদের জন্য তাদের দলীয় সদস্যদের চাইতেও অধিক উত্তম। আর এই কথা তারা নিজ মুখেই স্বীকার করে এবং বলে: তোমরা আমাদের সঙ্গে এত ইনছাফপূর্ণ আচরণ করছ, যতটা আমরা একে অপরের সঙ্গে করি না। আর এর মূল কারণ হলো, তারা যেই মৌলিক নীতির উপরে একত্রিত হয়েছে, তাহলো অজ্ঞতা ও অন্ধকারের উপরে প্রতিষ্ঠিত একটি বাতিল নীতি। আর এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম তাদের চেয়েও বেশি নিষ্ঠাসম্পন্ন হবে।

আমি বলব: ইমাম আহমাদ এর আল 'ইলাল গ্রন্থে (১৫৬ পৃষ্ঠা) মাররুযীর বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন: আমি তাকে (ইমাম আহমাদকে) প্রশ্ন করলাম: ইবরাহীম ইবনুল মুহাজির সম্পর্কে, তিনি তাকে লায়্যিনুল হাদীছ বলে অভিহিত করলেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি: ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন আব্দুর রহমান বিন মাহদীর উপস্থিতিতে মন্তব্য করেছেন, তিনি বলেছেন: ইবরাহীম ইবনুল মুহাজির ও আরেকজন ব্যক্তির নাম তিনি উল্লেখ করে তিনি বলেছেন "তারা উভয়েই দ্বয়ীফ ও মাহীন অর্থাৎ উভয়েই স্মৃতি শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে দুর্বল"। তখন আব্দুর রহমান অত্যন্ত কষ্টে এই কথা সহ্য করলেন এবং এমন মন্তব্য শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন আর বললেন: তারা উভয়েই বুদ্ধিমত্তায় দুর্বল?

ক্বায়দা-৭: মতানৈক্য আহলুল হাদীছের মধ্যেও সংঘটিত হয়। কিন্তু এই মতানৈক্যের ফলে তারা বিচ্ছিন্ন হয় না।

শায়খুল ইসলাম মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে (৬/ ৩১১) বলেছেন: এরপরে মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে আহলুল হাদীছের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্যের বিষয়টি অন্যদের তুলনায় নিতান্তই কম। কারণ, তাদের মীরাস হলো নবূওয়াত এর 'ইলম।

আল্লামা ছ্বালিহ বিন মাহদী আল মাক্ববিলী আল 'ইলমুশ শামিখ ফী তাফদ্বীলিল হাক্বি 'আলাল আবায়ি ওয়াল মাশায়িখ গ্রন্থে (২৭০ পৃষ্ঠা) বলেছেন: নাজাতপ্রাপ্ত দল হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, কখনোই তাদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য সৃষ্টি হবে না, কারণ, এটা মহান ছাহাবাদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। আলোচনার বিষয়বস্তু হলো এমন নিন্দিত মতানৈক্য, যা মতানৈক্যকারীকে একটি নতুন স্বয়ংসম্পূর্ণ মতাদর্শ ও দল গঠনে বাধ্য করে।

ক্বায়দা-৮: ভুলকথা প্রত্যাখ্যানযোগ্য যদিও সেই কথার প্রবক্তা আহলুল হাদীছ হয়।

যদি আহলুল হাদীছ কোনো আলেম কোনো মাসআলায় ভুল করে থাকে, তাহলে তার কথাও প্রত্যাখ্যাত, ঐ মাসআলায় তার মন্তব্যকে আহলুল হাদীছ এর আরেকটি মত বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। বরং ছ্বহীহ এটাই যে, ঐ কথাটিকে তার বক্তার দিকেই নিক্ষেপ করতে হবে। আর তার ভুলকে স্বীকার করে নিতে হবে। কারণ, মূল বিবেচ্য বিষয় হলো দলীল ও প্রমাণ, বক্তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

শায়খুল ইসলাম মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে (৩/১১০) বলেছেন: আহলুস সুন্নাহর মধ্যে কেউ কেউ ভুল করবে, এটা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তারা এই ভুলের উপর একমত হয় না।

ক্বায়দা-৯: হক্ব সর্বদা আহলুল হাদীছদের মধ্যেই বিদ্যমান।

শায়খুল ইসলাম মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে (৫/১৬৬) বলেছেন: আহলুল হাদীছ কখনো নবী – ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর কোনো একটি বাণীর

বিরোধিতায়ও একমত হয়নি। হক্ব সর্বদা আহলুল হাদীছদের মধ্যেই বিদ্যমান। তারা সর্বদাই নবী – ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর আনীত বিধানের উপরে ঐকমত্য পোষণ করেছে। যারা তাদের আদর্শের বিরোধিতা করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ এর বিরোধিতা করেছে।

তিনি মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে (৫/১৮২) আরো বলেছেন: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল হাদীছের সঙ্গে সর্বদা হক্ব বিদ্যমান থাকে। আর যারা তাদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে তাদের সঙ্গেও হক্ব সর্বদা বিদ্যমান থাকে, তাদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করার কারণে। আর যারা তাদের সঙ্গে দীনের সকল বিষয়ে বিরোধিতা করে, তারা মূলত হক্ব থেকে বঞ্চিত। কেননা, হক্ব রসূলের সঙ্গে, তাই যে তাঁর সুন্নাহ এর ব্যাপারে যতবেশি জানবে, যতবেশি তাঁর সুন্নাহ এর অনুসরণ করবে, হক্ব ততই তার সঙ্গে বিদ্যমান থাকবে।

আমি বলব: শায়খুল ইসলাম এর এই বক্তব্যটি আহলুল হাদীছ জামা'আতের ব্যাপারে, কোনো ব্যক্তি বিশেষ আহলুল হাদীছ এর সদস্যের ব্যাপারে নয়। যেমনটি স্পষ্ট, কেননা; ব্যক্তি আহলুল হাদীছ ভুল থেকে মুক্ত নয়, তাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছে, যারা ফক্বীহ নয়, আবার অনেকে এমনও আছে, যারা বিদ'আতের অনুসারীদের সঙ্গে ন্যায়-ইনছাফের আচরণ করতে পারে না, ঠিক এমনিভাবে আহলুল হাদীছের ব্যাপারে অন্যান্য ইমামগণের প্রশংসাও তাদের মানহাজ ও আদর্শের ভিত্তিকে কেন্দ্র করে, যেখানে আহলুল হাদীছ বলতে আহলুল হাদীছ জামা'আত ও তাদের ইমামগণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাদের সাধারণ সদস্য ও ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়।

শায়খুল ইসলাম একই কিতাবে (১৮/৫২) বলেছেন: কালাম শাস্ত্রবিদগণ যখন পরবর্তী আহলুল হাদীছ আলেমদের ব্যাপারে সমালোচনা করে এবং স্বল্প বুদ্ধির দোষে তাদেরকে দোষারোপ করে এই মর্মে যে, তারা হাদীছের অর্থ বুঝে না এবং ছহীহ দ্বয়ীফ হাদীছের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। আর তাদের উপরে নিজেদের বিচক্ষণতা ও যথার্থ বিবেচনার গর্ব করে, আর এই ব্যাপারে সন্দেহও নেই যে, এই দোষটা তাদের (আহলুল হাদীছ) অনেকের মধ্যেই বিদ্যমান আছে, যে তারা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাগত মাসায়েল, মৌলিক নীতিমালা, মানব রচিত অনেক মিথ্যা বর্ণনা ও ভুল ঘটনাবলি বিবৃতির ক্ষেত্রে তারা বানোয়াট হাদীছ দ্বারা দলীল উপস্থাপনের চেষ্টা করে, তারা (আহলুল হাদীছ) কুরআন ও হাদীছ থেকে এমন উদ্ধৃতি পেশ করে, যার মর্ম তারা নিজেরাই বুঝে না, কিন্তু তাদের অবস্থা এই

ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় ঠিক অনুরূপ, যেরূপ মুসলিমদের অবস্থা অন্যান্যধর্মের অনুসারীদের তুলনায়। যেমন, প্রত্যেক এমন অনিষ্ট কর্ম, যা কোনো কোনো মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান, তা অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে আরো ভয়ঙ্কররূপে বিদ্যমান, ঠিক এমনিভাবে আহলুল হাদীছ এর সদস্যদের অবস্থাও অন্যান্য দলের সদস্যদের তুলনায় অনুরূপ।

আমি বলব: যখন আহলুল হাদীছের কোনো একজন সদস্য কোনো ভুল করে, তখন সেই ভুলের দায়ভার আহলুল হাদীছ জামা'আতের উপরে চাপানো সঠিক নয়। যেমন অনেকে বলে: আহলুল হাদীছের মধ্যে কোনো ভালো ফক্বীহ নেই। কারণ, সে আহলুল হাদীছের এমন অনেক সদস্যকে দেখেছে, যারা ফক্বীহ নয় অথবা সালাফীদের মধ্যে অনেক কঠোরতা আছে এমন কথা বলা। কারণ, সে এমন কিছু সালাফীকে দেখেছে, যাদের মধ্যে কঠোরতা অনেক বেশি।

ক্বায়দা-১০: আহলুল হাদীছ দীনের সকল মাসআলার উপর আমল করে এবং সকল মাসআলাকেই শক্ত করে আঁকড়ে ধরে।

আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ এর মধ্যে বিদ্যমান সকল বিষয়ই আহলুল হাদীছ শক্ত করে আঁকড়ে ধরে এবং সেই অনুসারে আমল করে। তারা দীনের একটি অংশ মূল, যা আমলযোগ্য, আর অপর অংশটি অপ্রয়োজনীয়, যা আমলযোগ্য নয়, এভাবে বিভক্ত করে না। বরং এমন বিভাজন বাত্বিল বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইসলামে প্রবেশ করো পরিপূর্ণরূপে" [আল বাক্বারা: ২০৮]।

ইবনু কাছীর তার তাফসীরে (১/২৪৭) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশ্বাসকারী ও তাঁর রসূলকে সত্যায়নকারী বান্দাদেরকে আদেশ দিয়ে বলেছেন যে, তারা যেনো ইসলামের সকল বন্ধন ও সকল বিধানকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, ইসলামের সকল আদেশ মেনে চলে এবং সকল নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে চলে যতক্ষণ পর্যন্ত এই রাস্তায় চলা তাদের জন্য সম্ভব হয়।

ক্বাযী ‘আয়াদ্ব তারতীবুল মাদারিক গ্রন্থে (১/১৮৪) বর্ণনা করেছেন: একদা এক ব্যক্তি ইমাম মালিককে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে ইমাম মালিক তাকে উত্তরে বললেন: আমি জানি না, তখন প্রশ্নকারী তাকে বলল: এটা তো একটি সহজ মাসআলা, আমি মাসআলাটি আমীরকে জানাতে চাই, তখন ইমাম মালিক রেগে গেলেন এবং বললেন: মাসআলাটি সহজ হালকা? ‘ইলমের মধ্যে সহজ বলে কিছু নেই, তুমি কি আল্লাহর এই বাণী শুনোনি:

﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾

“নিশ্চয় আমি আপনার উপরে ভারী কথা অবতীর্ণ করব” [আল মুযযাম্মিল: ৫] ।

সুতরাং ‘ইলমের প্রতিটি অংশই ভারী, বিশেষ করে যেই বিষয়ে ক্বিয়ামতের দিবসে প্রশ্ন করা হবে।

অধ্যায়: ৪

قواعد في الدليل

দলীলের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা

ক্বায়দা-১: যেকোনো মূলনীতি অথবা মাসআলা গঠনের মূলভিত্তি হলো দলীল।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়্যাহ মাজমূ’ ফাতাওয়া গ্রন্থে (৩০/২৬৯) বলেছেন: কখনো কখনো নবী – ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এমন নছ্ব (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) ব্যবহার করে থাকেন, যেই নছ্বটি ক্বায়দা বা মূলনীতি হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু নছ্বটি অনেক আলেমদের দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় তারা উক্ত ক্বায়দার অধীন কিছু কিছু বিধানের ব্যাপারে অন্য আলেমদের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছলেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে তারা দ্বিমত পোষণ করেন তাদের নিকটে উক্ত নছ্বটি না পৌঁছানোর কারণে। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো মুদ্বারাবার (লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বে যৌথ ব্যবসা) মাসআলা, যেখানে তারা সকলেই এই পদ্ধতিটি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে

একমত। পক্ষান্তরে মুসাক্বাত (ফলের বাগান বর্গাচাষ) ও মুযারাআহ (ফসলের জমি বর্গাচাষ) এর পদ্ধতিটি নছ্ব দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরেও তারা একে অপরের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন অথচ মুদ্বারাবা সরাসরি নছ্ব দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং ছাহাবাদের কার্যক্রম দ্বারা সাব্যস্ত। এই জন্যেই হাদীছ শাস্ত্রের ফক্বীহগণ মূলনীতি গঠন করেন নছ্ব দ্বারা। আর এই মূলনীতির আলোকে শাখাগত মাসআলা প্রণয়ন করেন। নছ্ব সম্বলিত কোনো মূলনীতির ব্যাপারে তারা মতানৈক্য করেন না। আর যেই ব্যাপারে সরাসরি নছ্ব নেই, সেই ব্যাপারে তারা কখনো কখনো একমত পোষণ করেন।

শায়খুল ইসলাম মাজমূ' ফাতাওয়ায় (৬/৪২৮) আরো বলেছেন: কারণ (কোনো মাসআলার ভিত্তি) এর উপস্থিতি সংশ্লিষ্ট মাসআলা এর উপস্থিতির দাবি রাখে। তবে উক্ত মাসআলার কোনো শর্ত যদি বিদ্যমান না থাকে অথবা যদি উক্ত মাসআলার কোনো অন্তরায় থেকে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। আর শর্ত ও অন্তরায়সমূহ মূলত দলীলের উপর নির্ভরশীল।

ক্বায়দা-২: শারঈ বিধি-বিধান ছ্বহীহ হাদীছ থেকে প্রণয়ন করতে হবে, দ্বয়ীফ হাদীছ থেকে নয়।

আল্লাহ তা'আলার দীনের কোনো বিধান একমাত্র ছ্বহীহ হাদীছ ছাড়া অন্য কোনো উৎস থেকে নেওয়া জায়েয নেই। দ্বয়ীফ হাদীছ পরিত্যক্ত, আমলযোগ্য নয়। আল্লাহ এই উম্মাহকে সনদের মহত্ব দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর (হাদীছের) সনদ হলো দীনের অন্যতম ভিত্তি, বিধায় ছ্বহীহ সনদকে মানতে হবে। আর দুর্বল সনদকে পরিত্যাগ করতে হবে। কোনো মুসলিমের জন্য কোনো হাদীছ থেকে বিধান প্রণয়ন করা ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে "উক্ত হাদীছের সনদ ছ্বহীহ কি না" এই বিষয়টি না জানবে।

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনু হাম্বাল (ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন এর ৪/১১৭৯ বর্ণনানুযায়ী) বলেছেন: আমি আমার পিতাকে "যার নিকট হাদীছ শাস্ত্রের সংকলিত অনেকগুলো কিতাব আছে, যার দ্বয়ীফ মাতরূক হাদীছ চেনার দক্ষতা ও শক্তিশালী সনদকে দুর্বল সনদ থেকে পৃথক করার যোগ্যতা নেই, তাহলে তার জন্যে কি যেকোনো হাদীছের উপর আমল করা ও যেকোন হাদীছকে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী ফাতাওয়া দেওয়া জায়েয আছে? তিনি বললেন: না। সে এভাবে আমল করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে

আলেমদের থেকে উক্ত হাদীছগুলোর মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য তা জেনে না নিবে। তারপরেই কেবল তার আমলটি ছ্বহীহ হবে।

ছ্বহীহ মুসলিমের সংকলক ইমাম মুসলিম আত-তাময়ীয গ্রন্থে (২১৮ পৃষ্ঠা) বলেছেন: জেনে রাখো — আল্লাহ তোমার উপরে রহম করুন — নিশ্চয় হাদীছ শাস্ত্রে দক্ষতা ও হাদীছের সনদসমূহ অর্থাৎ হাদীছ ছ্বহীহ হওয়া বা দুর্বল হওয়া সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করাটা বিশেষভাবে আহলুল হাদীছের বৈশিষ্ট্য। কারণ, তারাই সাধারণ বর্ণনাগুলোকে হিফয করে রাখে, তারাই ঐ বর্ণনাগুলো সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় ভালো জানে। কারণ, তারা তাদের দীনের ক্ষেত্রে যেই মূলভিত্তির উপর নির্ভর করে, তা হলো ওই সকল সুন্নাহ ও আছার, যেগুলো কালের পরম্পরায় আমাদের নবী — ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — এর যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত অবিকলভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে।

ইবনু রজব ফাদ্বলু 'ইলমিস সালাফ গ্রন্থে (৫৭ পৃষ্ঠা) বলেছেন: আহলুল হাদীছ ফক্বীহ ও ইমামগণ ছ্বহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন, তিনি যে স্থানেই থাকুক না কেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়্যাহ মাজমূ' ফাতাওয়া গ্রন্থে (১/২৫০) বলেছেন: শারঈ বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে এমন দুর্বল হাদীছের উপরে নির্ভর করা জায়েয নেই, যেগুলো হাসানের চেয়েও নিম্নপর্যায়ের।

ক্বায়দা-৩: দ্বয়ীফ হাদীছের উপর আমল করা জায়েয নেই, চাই তা ফাদ্বায়েলে আমলের ক্ষেত্রে হোক অথবা অন্যকোনো ক্ষেত্রে হোক।

আদেশ সংক্রান্ত বিধানগুলোতে ছ্বহীহ দলীল ব্যতীত কোনো কথা বলা যাবে না, কোনো বিধান মুস্তাহাব হওয়াটাও একটি অন্যতম আদেশ সংক্রান্ত বিধান। বিধায়, কোনো বস্তু মুস্তাহাব হওয়া সাব্যস্ত করার জন্যেও ছ্বহীহ দলীলের প্রয়োজন। তাই আমলের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছগুলোও ছ্বহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। কারণ, এগুলোও দায়িত্ব সংক্রান্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত আর সেই বিধানটি হলো মুস্তাহাব হওয়া। আর তাছাড়া সালাফগণ কখনো আমলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত হাদীছ ও দীনের অন্যান্য শাখার সাথে সম্পর্কিত হাদীছের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য করতেন না। আর এই বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে "তারা সনদ শক্তিশালী হওয়া, সনদের ভিত্তিতে হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে কঠোর হওয়া ও ছ্বহীহ সনদের হাদীছ অনুসারে

আমল করার ব্যাপারে তারা আলোচনা করেছেন, কিন্তু তারা আমলের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছগুলোকে এই সাধারণ নীতি থেকে বাদ দেননি। বরং তাদের কারো থেকে এই ব্যাপারে কখনো কোনো বিবৃতিও আসেনি। এই বিষয়টি, এখন যদি কেউ বলে: ইমাম আহমাদ ও কোনো কোনো ইমাম থেকে এমন বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে তারা বলেছেন: যখন আমাদের নিকট বিধি-বিধান ও হালাল-হারাম সম্পর্কিত হাদীছ আসে, তখন আমরা সেই হাদীছগুলোর ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করি। আর যখন আমাদের নিকট আমলের ফযীলত, ছাওয়াব ও শাস্তি সম্পর্কিত হাদীছ আসে, তখন আমরা সহনশীলতা প্রদর্শন করি।

এর উত্তর হলো: এই সহনশীলতার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাদীছ বর্ণনা করার ব্যাপারে সহনশীলতা প্রদর্শন, আমলের ফযীলত সম্পর্কিত উক্ত দ্বয়ীফ হাদীছের আলোকে আমল করার বৈধতা প্রদানে সহনশীলতা প্রদর্শন উদ্দেশ্য নয়, হাদীছ বর্ণনা এক বিষয়, আর হাদীছের উপর আমল করা ভিন্ন বিষয়।

মু'আল্লিমী আল আনওয়ারুল কাশিফা গ্রন্থে (৮৭ পৃষ্ঠা) বলেছেন: অনেক ইমাম হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে এতো কঠোর ছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে কোনো হাদীছ "ছ্বহীহ অথবা ছ্বহীর নিকটতম অথবা হাদীছটির কোনো শাহেদ হাদীছ পাওয়া গেলে হাদীছটি ছ্বহীহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে" এই বিষয়টি নিশ্চিত না হবে, কিংবা হাদীছটি যদি এর চেয়েও নিম্নস্তরের হয়, তাহলে তিনি কোনোভাবেই উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করতেন না।

আবার তাদের মধ্যে এমনও অনেক ইমাম ছিলেন, তিনি যদি এমন হাদীছ পেতেন, যা কঠিন পর্যায়ের দুর্বল নয়, যেই হাদীছে কোনো বিধান ও সুন্নাহ এর বর্ণনা নেই, বরং হাদীছটি কোনো একটি সর্বস্বীকৃত আমলের ফযীলতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেমন পাঁচ ওয়াক্তত ছ্বলাত ও এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়ের ফযীলত সম্পর্কিত, তাহলে এই অবস্থায় তিনি ঐ হাদীছ বর্ণনা করা থেকে নিবৃত্ত হতেন না, তাদের বাক্যে সহনশীলতা বলে এমন সহনশীলতাকেই বোঝানো হয়েছে।

ইমাম নববী "আমলের ফযীলতের সঙ্গে সম্পৃক্ত দ্বয়ীফ হাদীছ আমলযোগ্য" এই বিষয়টি ইজমার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করেছেন, তবে এই বিষয়টি ইজমার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কি না, তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়্যাহ মাজমূ' ফাতাওয়া গ্রন্থে (১/২৫১) বলেছেন: আর এই বিষয়টি হলো এমন যে, যখন কোনো আমল সম্পর্কে এই বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, আমলটি কোনো শারঈ দলীল দ্বারা

সাব্যস্ত হয়েছে, আর উক্ত আমলের ফযীলতের ব্যাপারে এমন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যা মিথ্যা বলে প্রমাণিত নয়, তাহলে উক্ত আমলের ছওয়াবের বিষয়টি সত্য হতে পারে। কিন্তু কোনো ইমাম এই কথা বলেননি যে, কোনো দ্বয়ীফ হাদীছ দ্বারা মুস্তাহাব বা ওয়াজিব বিধান সাব্যস্ত করা যেতে পারে, যে এমন দাবি করে, সে ইজমার বিরোধিতা করে।

আমি বলব: শায়খুল ইসলামের কথায় বুঝা গেল যে, ইজমা ইমাম নববীর দাবির বিপরীত। আর স্বাভাবিকভাবে এটা বোঝা যায় যে, এই ইজমার বিপরীত দাবিগুলো পরবর্তী যুগে সংঘটিত হয়েছে।

শায়খুল ইসলাম মাজমূ' ফাতাওয়া গ্রন্থে (১৮/৬৫) আরো বলেছেন: এমনিভাবে আমলের ফযীলতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হাদীছগুলোর উপর আমল করার ব্যাপারে আলেমদের যেই মতামত, তার অর্থ এই নয় যে, দলীল হওয়ার যোগ্য নয় এমন হাদীছ দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা যাবে। কারণ, মুস্তাহাব হলো একটি শারঈ বিধান। সুতরাং এটা কোনো শারঈ দলীল ব্যতীত সাব্যস্ত হবে না। আর যে কোনো শারঈ দলীল ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে এই মর্মে সংবাদ দিল যে, আল্লাহ উক্ত আমলটি ভালোবাসেন, সে দীনের মধ্যে এমন বিধান উদ্ভাবন করল, যা পালন করার অনুমতি আল্লাহ দেননি, যেমন কেউ যদি (দলীল বিহীন) কোনো ওয়াজিব বা হারাম বিধান সাব্যস্ত করে। আর এই জন্যেই আলেমগণ মুস্তাহাব নিয়ে মতানৈক্য করেন, যেমন অন্যান্য বিধান নিয়ে মতানৈক্য করেন, বরং এটা দীনের একটি বিধিবদ্ধ মূলনীতি।

শাওকানী ওয়াবলুল গামাম গ্রন্থে (১/৫৪) বলেছেন: অনেক আলেম এই বিষয়ে কোনো শর্ত ছাড়াই দ্বয়ীফ হাদীছের উপর আমল করার অনুমতি দিয়েছেন। আবার অনেক আলেম যেই হাদীছ দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যায় না এমন হাদীছের উপর আমল করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, আর এটাই সত্যি। কারণ, সকল শারঈ বিধান একই মানের। সুতরাং যেই বিধান শরী'আতের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি, তা শরী'আতের দিকে সম্বন্ধ করা বৈধ নয়।

কারণ হলো আল্লাহ যা বলেননি তা আল্লাহর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলা। আর আমলের ফযীলতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হাদীছের দিকে যদি কোনো আমলকে সম্পৃক্ত করা হয়, তাহলে এই সম্পৃক্তকরণটা কেমন যেনো নির্দেশিত বস্তুকে নির্দেশক এর প্রতি বা প্রমাণিত বস্তুকে প্রমাণ এর প্রতি নির্দেশ করার ন্যায়। এই অবস্থায় এই হাদীছের উপর আমলকারী ব্যক্তি যদিও ছলাত, ছিয়াম

অথবা যিকর জাতীয় যেকোনো ভালো আমলই করুক না কেন, সে উক্ত কর্মে শরী'আতসম্মত নয় এমন কর্মকে শরী'আতসম্মত মনে করায় বিদ'আতী বলে বিবেচিত হবে। আর সেই আমলের প্রতিদান তার বিদ'আতের গুনাহ এর সমানও হবে না। আর দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয় এমন কাজে কখনো একনিষ্ঠ কল্যাণ থাকতে পারে না। বরং এমন কাজের সাথে বিদ'আতের গুনাহ এর ন্যায় অকল্যাণ সংযুক্ত থাকে। আর কল্যাণ অর্জনের চেয়ে অকল্যাণ প্রতিহত করা অধিক জরূরী।

আবার অনেকে বলেছেন: যদি ঐ ফযীলতপূর্ণ আমলটি, যা দুর্বল হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, সেই হাদীছটি যদি কোনো অন্তর্ভুক্তকারী ব্যাপক অর্থবোধক ছ্বহীহ হাদীছের আওতাধীন হয়ে থাকে, যেই হাদীছটি উক্ত আমলের ফযীলতের উপর কোনোভাবে নির্দেশক হয়ে থাকে, তাহলে ঐ ব্যাপারে দুর্বল হাদীছের উপরে আমল করা বৈধ হবে, অন্যথায় বৈধ হবে না। যেমন: মাকরূহ ওয়াক্বতের বাহিরে যদি দুই রাক'আত ছ্বলাতের কোনো ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত দুই রাক'আত ছ্বলাত আদায় করলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, ব্যাপক অর্থবোধক সাধারণ দলীল কোনো শর্ত ছাড়াই ছ্বলাতের ফযীলতের উপর নির্দেশক, তবে কিছু বিশেষ দলীলও আছে।

কেউ কেউ বলেছেন: যদি উক্ত ছ্বহীহ ব্যাপক অর্থবোধক সাধারণ দলীলের উপর আমল করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে সাব্যস্ত হয়নি এমন বিশেষ হাদীছটিকে বিবেচনায় রাখলে একমাত্র বিদ'আতে পতিত হওয়া ছাড়া আর কোনো ভালো পরিণাম নেই। আর যদি একই আমল শুধুমাত্র বিশেষ ঐ দুর্বল দলীলের আলোকে করে থাকে, তাহলে প্রথম কথাই প্রযোজ্য, অর্থাৎ বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কোনো ফলাফল নেই। আর যদি একই আমলটি উভয় দলীলকে (অর্থাৎ ব্যাপক অর্থবোধক সাধারণ দলীল ও বিশেষ দলীল, যা দুর্বল হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত) বিবেচনায় রেখে করে, তাহলে এই আনুগত্যমূলক কাজটি বিদ'আত সম্বলিত একটি আমল হবে। কারণ, একটি শারঈ 'ইবাদতকে শরী'আহ বহির্ভূত আমলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ছ্বহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব এর ভূমিকায় আল্লামা আলবানী – রহিমাহুল্লাহু – এই মাসআলার একটি দীর্ঘ চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন, যার দরকার হয়, সে যেনো সেখান থেকে দেখে নেয়।

ক্বায়দা-৪: দলীল সেভাবেই বুঝতে হবে যেভাবে সালাফে ছ্বলিহীন বুঝেছেন।

সালাফে ছ্বলিহীন এর আদর্শের ব্যাপারে সত্যায়নমূলক ও তাদের পথ অনুসরণ করার পক্ষে অনেক দলীল এসেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহান কিতাবে বলেছেন:

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾

"পূর্ববর্তী মুহাজির ও আনছ্বারদের প্রথম সারির ব্যক্তিবর্গ এবং ঐ সকল ব্যক্তি, যারা হুবহু তাদেরকে অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাও আল্লাহর ব্যাপারে সন্তুষ্ট, তিনি তাদের জন্য এমন বাগানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকে, যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে, এটাই হলো মহা সাফল্য" [আত-তাওবাহ: ১০০] ।

ইবনু মাস'ঊদ থেকে বর্ণিত, নবী – ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – বলেছেন:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

"সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, এরপরে সর্বোত্তম যুগ হলো পরবর্তীদের যুগ, এরপরে সর্বোত্তম যুগ হলো পরবর্তীদের যুগ"। ছ্বহীহ বুখারী হাদীছ নং ৬৪২৯, ছ্বহীহ মুসলিম হাদীছ নং ২৫৩৫।

সুতরাং তারাই হলো অনুকরণীয়, তারাই হলো অনুসরণযোগ্য। তাই সকল মুসলিমের উপরে ওয়াজিব হলো তারা স্বীয় মত ও আদর্শ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ থেকে দলীল গ্রহণের পাশাপাশি তাদের পদ্ধতিকে অনুসরণ করবে। কারণ, তারা হলেন শারঈ নুছূছ এর প্রামাণিকতা ও নির্দেশনার ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞানী ও সর্বোচ্চ তিক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী। বিধায়, কোনো মুসলিম যখন তাদের বিচার-বিবেচনা পদ্ধতির বাহিরে যেয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করবে, তখন সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে। কারণ, তারা

পূর্ণ বিচক্ষণতার সহিত পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন।

ইবনু আবী যায়েদ আল ক্বায়রাওয়ানী আল জামে' গ্রন্থে (১১৭ পৃষ্ঠা) বলেছেন: সুন্নাহ এর সামনে নিজেকে এমনভাবে সমর্পণ করতে হবে যে, কোনো যৌক্তিক সিদ্ধান্ত দ্বারা সুন্নাহকে সাংঘর্ষিক বানানো যাবে না এবং কোনো ক্বিয়াস দ্বারা সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। তবে সালাফে ছ্বলিহীন যেই ব্যাখ্যা করেছেন, আমরাও সেই ব্যাখ্যাকে মেনে নিব। তারা যেভাবে আমল করেছেন, আমরাও সেইভাবেই আমল করব। তারা যেটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেটাকে আমরাও প্রত্যাখ্যান করব। তারা যেই বিষয় থেকে বিরত থেকেছেন, আমরাও সেই বিষয় থেকে বিরত থাকব। যেই বিষয়টি তারা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই বিষয়ে আমরা তাদের অনুকরণ করব। আর যেই বিধান তারা হাদীছের আলোকে প্রণয়ন করেছেন, সেই বিধানের ক্ষেত্রে আমরা তাদের অনুগামী হব। তারা যেই বিষয়ে মতানৈক্যে জড়িয়েছেন অথবা ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, সেই বিষয়ে আমরা জামা'আত পরিত্যাগ করব না। আর ইতোপূর্বে আমরা যতগুলো বিষয়ের আলোচনা করে আসলাম, তার সবগুলোই আহলুস সুন্নাহ এর অনুসারীবৃন্দ ও ফিক্বহ এবং হাদীছ শাস্ত্রের ইমামদের কথা।

ইমাম ছ্বান'আনী ছ্বওনুল মানত্বিক্ব গ্রন্থে (১৫৮ পৃষ্ঠা) বলেছেন: আমাদেরকে আনুগত্য করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই বিষয়ে আমাদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, বিদ'আতে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে আমাদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে। আহলুস সুন্নাহ এর নিদর্শন হলো সালাফে ছ্বলিহীন এর অনুকরণ করা এবং প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিদ'আতকে বর্জন করা।

ক্বাওওয়ামুস সুন্নাহ আল আছ্ববাহানী আল হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ গ্রন্থে (২/৪৩৭, ৪৪০) বলেছেন: অধিক বর্ণনা করতে পারা একমাত্র 'ইলম নয়। 'ইলম হলো একমাত্র অনুসরণ ও হাদীছের যথাযথ ব্যবহার। ছাহাবা ও তাবেঈন এর অনুসরণ করা আবশ্যক, যদিও অনুসরণকারী অল্প জ্ঞানের অধিকারী হয়। যে ছাহাবা ও তাবেঈনের আদর্শের বিরোধিতা করে, সে পথভ্রষ্ট, যদিও সে অনেক জ্ঞানের অধিকারী হয়।

অবশেষে তিনি বলেছেন: এটা এই জন্যে যে, মানুষের সামনে তাদের দীনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। তাই আমাদের জন্য তাদেরকে অনুসরণ করা

আবশ্যক। কারণ, দীন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে, মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি আর চিন্তাধারার আলোকে দীন গঠিত হয়নি।

নবী — ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — সুন্নাহকে তাঁর উম্মাহর জন্য ব্যাখ্যা করে গেছেন। তাঁর ছাহাবাগণের নিকট তা সুস্পষ্টরূপে দেখিয়ে দিয়েছেন। বিধায়, যে দীনের কোনো একটি বিষয়ে আল্লাহর রসূল — ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — এর ছাহাবা — রদ্বীয়াল্লাহু আনহুম — এর বিরোধিতা করল, সে পথভ্রষ্ট হলো।

ইবনু রজব ফাদ্বলু 'ইলমিস সালাফ 'আলা 'ইলমিল খালাফ গ্রন্থে (৭২ নং পৃষ্ঠা) বলেছেন: সকল 'ইলমের মধ্যে সর্বাধিক উপকারী 'ইলম হলো কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ এর নছ্বসমূহ সংরক্ষণ করা, নছ্বসমূহের অর্থ সঠিকরূপে উপলব্ধি করা। আর এই উপরোক্ত বিষয়টি অর্থাৎ ক্বুরআন-হাদীছ এর অর্থ, ছাহাবা ও তাবেঈনদের থেকে বর্ণিত হালাল-হারাম সংক্রান্ত মাসআলাগুলোর সঠিক অর্থ, যুহদ, রাক্বাইক্বও মা'আরিফ সংক্রান্ত মাসআলাসমূহের সঠিক অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র "ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন থেকে বর্ণিত আছারসমূহ" মেনে চলা।

শায়খুল ইসলাম কিতাবুল ঈমান গ্রন্থে (১১৪ পৃষ্ঠা) বলেছেন: মুরজিয়া ফিরক্বার অনুসারীরা এই মৌলিক বিষয়ে (অর্থাৎ ঈমানের বিষয়ে) কিতাব, সুন্নাহ, ছাহাবা ও তাবেঈনদের উদ্ধৃতি বর্ণনা থেকে অনেক দূরে। আর তারা নিজেদের যুক্তি ও ভাষাবিদ্যার উপর নির্ভরশীল হয়েছে। এটাই হলো বিদ'আতের অনুসারীদের রীতি।

এই জন্যে ইমাম আহমাদ বলতেন: মানুষ অধিকাংশ ভুল করে থাকে ব্যাখ্যা ও ক্বিয়াস কার্যপদ্ধতির ক্ষেত্রে। এই জন্যেই আমরা মু'তাযিলা, মুরজিয়া ও রাফেযীসহ অন্যান্য বিদ'আতীদেরকে দেখি যে, তারা ক্বুরআন এর তাফসীর ও ভাষাগত ব্যাখ্যা করে থাকে তাদের বুদ্ধি ও মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান দ্বারা। এই জন্যেই তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা নবী — ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — এর হাদীছসমূহ, ছাহাবা, তাবেঈন ও মুসলিম ইমামগণ এর উদ্ধৃতির উপরে নির্ভর করে না। তারা সুন্নাহ, সালাফদের ইজমা' ও তাদের আছারসমূহের উপরে নির্ভর করে না। তারা একমাত্র নির্ভর করে যুক্তি ও ভাষাবিদ্যার উপরে। আমি তাদেরকে দেখেছি তারা উদ্ধৃতিপূর্ণ তাফসীরের কিতাবগুলো, হাদীছ ও সালাফদের আছারসমূহের উপরে নির্ভর করতে পারে না।

তিনি মাজমূ’ ফাতাওয়ায় (১০/৩৬২) আরো বলেছেনঃ সুতরাং শরী’আহ সম্মত জ্ঞান ও শরী’আহ সম্মত ইবাদত আল্লাহর রসূল – ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর ছাহাবাদের থেকে গ্রহণ করতে হবে। তাদের পরবর্তীতেদের থেকে যা এসেছে, সেটাকে মূলনীতির স্থানে রাখা যাবে না। যদিও পরবর্তী ব্যক্তি ওযরগ্রস্ত হয় এবং সে ইজতিহাদ অথবা তাক্বলীদ এর কারণে প্রতিদান প্রাপ্তও হয়ে থাকে।

যে মৌলিক বা শাখাগত কোনো মাসআলার ভিত্তি কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত আছারসমূহের উপর স্থাপন করল, সে নবূওয়াত এর পথের দিশা পেল। এমনিভাবে যে ব্যক্তি ইচ্ছা (কোনো কাজের নিয়্যাত করা), ইবাদত, আমল ও শ্রুত যেগুলো মৌলিক আমল ও শাখাগত আমলের সঙ্গে সম্পৃক্ত; যেমন, অন্তরের অবস্থাসমূহ ও শারীরিক আমলসমূহ ইত্যাদির ভিত্তি ঈমান, সুন্নাহ ও মুহাম্মাদ – ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – ও তাঁর ছাহাবাগণ এর হেদায়েতের উপরে স্থাপন করল, সেও নবূওয়াতের পথের দিশা পেল। এটাই হলো হেদায়েতপ্রাপ্ত ইমামগণের পথ।

তুমি দেখবে, ইমাম আহমাদ যখন সুন্নাহ এর উছূলসমূহ বর্ণনা করেন, তখন বলেনঃ সুন্নাহ হলো আল্লাহর রসূল – ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর ছাহাবাগণের মতাদর্শকে ও নবী – ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর এবং ছাহাবাগণ ও তাবেঈন থেকে বর্ণিত তাফসীরের গ্রন্থসমূহ আঁকড়ে ধরা। আর এর উপরেই তাফসীর এর মৌলিক ও শাখাগত শাস্ত্রগুলোতে নির্ভর করতে হবে, এমনিভাবে যুহদ, রাক্বাইক্ব ও আহওয়াল এর অধ্যায়গুলোর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। কারণ, তিনি (ইমাম আহমাদ) কিতাবুয যুহদ এর মধ্যে নবীগণ – ছ্বালাওয়াতুল্লহি আলাইহিম – এর মধ্যে আদম থেকে মুহাম্মাদ পর্যন্ত নবীদের সম্পর্কে বর্ণিত আছার এর উপর নির্ভর করেছেন, এরপরে ছাহাবা ও তাবেঈন এর আদর্শের উপর নির্ভর করেছেন, এরপরবর্তী আর কোনো প্রজন্মের যুহদ এর কথা তিনি আলোচনা করেননি।

সতর্কবাণীঃ সালাফে ছ্বলিহীন থেকে সকল দলীলের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। বিধায় এই ক্বায়দাটি ঐ সকল দলীলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যেগুলোর ব্যাখ্যা সালাফদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সকল দলীলের ক্ষেত্রেই সালাফদের ব্যাখ্যা তলব করা যাবে না, যেই দলীলের ব্যাখ্যা সালাফদের থেকে বর্ণিত হয়েছে, সেই দলীলের ব্যাখ্যা তাদের থেকেই গ্রহণ করতে হবে। আর যেই দলীলের ব্যাখ্যা সালাফদের থেকে বর্ণিত হয়নি, সেই

দলীলের ব্যাখ্যা ছাড়াই বাহ্যিক অর্থ ও মৌলিক অর্থের উপর নির্ভর করতে হবে।

ক্বায়দা-৫: কোনোরূপ ব্যাখ্যা ছাড়াই দলীলের বাহ্যিক অর্থ মেনে নেওয়া ওয়াজিব।

একদল হলো এমন, যারা দলীলসমূহের ব্যাখ্যার দিকে কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ না করে শুধুমাত্র বাহ্যিক অর্থকে প্রাধান্য দিতে যেয়ে অতি বাড়াবাড়ি করে। আরেকদল হলো এমন, যারা বাহ্যিক অর্থকে এতটাই অবহেলা করে যে, তারা তাদের ইমামের মত ও হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের তাগিদে সামান্য কোনো কারণে দলীলের বাহ্যিক অর্থকে প্রত্যাখ্যান করে অথবা হাদীছের ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়।

আহলুল হাদীছ হলো এই উভয় দলের মধ্যবর্তী পথের পথিক। যারা দলীলের সাধারণ বাহ্যিক অর্থকে গ্রহণ করে। তারা সাধারণ বাহ্যিক দলীলের কোনো ব্যাখ্যা করে না এবং সাধারণ বাহ্যিক অর্থের বাহিরে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না। তবে উক্ত ব্যাখ্যা বা বাহ্যিক অর্থের বাহিরে যেয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে কোনো দলীল থাকলে ভিন্ন কথা। এই জন্যেই সালাফগণ বলতেন: "এই নছ্গুলোকে (আল্লাহর ছিফাত সম্পর্কিত নছ্গুলো) ঠিক সেভাবেই তোমরা মেনে নিবে, যেভাবে বর্ণিত হয়েছে", এই বিবৃতি যদিও আসমা (আল্লাহর নামসমূহ) ও ছিফাত (আল্লাহর গুণাবলি) এর ক্ষেত্রে এসেছে। কিন্তু এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, সকল শারঈ বিধি-বিধান একই আঙ্গিকে একই পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হবে। এই জন্যেই সালাফগণ বিধি-বিধান (ফিক্বহী মাসায়িল) এর সাথে সম্পর্কিত হাদীছগুলোর মধ্যে কোনো প্রকার ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতেন না। বরং তারা ঐ হাদীছগুলোকে বাহ্যিক অর্থের আঙ্গিকেই প্রয়োগ করতেন।

উদাহরণস্বরূপ: নবী — ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — থেকে এই বর্ণনা সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাঁকে যখন উটের গোশত খাওয়ার পরে উযূ করার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন:

«تَوَضَّئُوا مِنْهَا»

"তোমরা উটের গোশত খেয়ে উযূ করো"। ছহীহ মুসলিম, হা/৩৬০, আবূ দাঊদ, হা/১৮৪, তিরমিযী, হা/৮১, ইবনে মাজাহ হা/৪৯৪।

উযূ শব্দের প্রয়োগ শুধুমাত্র দুই হাত ধৌত করার ব্যাপারেও হয়, আবার শারঈ উযূর ব্যাপারেও হয়। তবে হাদীছের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বোঝা যায় যে, উযূ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শারঈ উযূ। ছাহাবাগণ এই বাহ্যিক অর্থ অনুসারেই আমল করেছেন। তারা উটের গোশত খাওয়ার পরে সাধারণ শারঈ উযূ করতেন, তারা এই হাদীছে বর্ণিত উযূ শুধুমাত্র দুই হাত ধৌত করার অর্থে ব্যাখ্যা করেননি।

খত্বীব আল বাগদাদী আল-ফক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্বিহ গ্রন্থে (১/২২২) বলেছেন: আল্লাহর রসূল – ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর হাদীছকে সাধারণ অর্থে ও বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করা ওয়াজিব। তবে হাদীছে বাহ্যিক অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য এই ব্যাপারে যদি কোনো দলীল পাওয়া যায়, তাহলে দলীল কর্তৃক নির্দেশিত অর্থই গ্রহণযোগ্য।

ইমাম শাফেঈ বলেছেন: যদি হাদীছের বাহ্যিক উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে কোনো সম্ভাব্য বাত্বেনী (অপ্রকাশিত) উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করা জায়েয হতো, তাহলে অধিকাংশ হাদীছ একাধিক অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্বলিত হতো। তখন যেকেউ যেকোনো মত গ্রহণ করলে সে অন্যকারোর মতের উপরে নিজের মতকে প্রাধান্য দিতে পারত না। কিন্তু হক্ব তো এখানে মাত্র একটি, যা বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থের সাথে সংযুক্ত। তবে আল্লাহর রসূল – ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর থেকে যদি বাহ্যিক অর্থের ভিন্ন কোনো অর্থের প্রতি নির্দেশক কোনো হাদীছ প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা।

ইবনু তাইমীয়্যাহ মাজমূ' ফাতাওয়া গ্রন্থে (১৯/৭৪) বলেছেন: প্রায় সকল বিদ'আত ও প্রবৃত্তির অনুগামী মতাদর্শ মূলত দুইটি মূলনীতি থেকে গঠিত হয়।

প্রথমটি হলো ফাসিদ তাবীল (অকার্যকর ব্যাখ্যা)। দ্বিতীয়টি হলো ফাসিদ ক্বিয়াস।

ফাসিদ তাবীল (অকার্যকর ব্যাখ্যা): আল্লাহর রসূলের এমন কোনো হাদীছ, যা কোন মুজতাহিদের নিকটে পৌঁছেছে, কিন্তু তা ছহীহ নয় অথবা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য ব্যক্তি থেকে বর্ণিত কোনো আছার, যেই আছার এ বর্ণিত মাসআলায় সে উক্ত ব্যক্তির তাক্বলীদ করেছে, কিন্তু সেই ব্যক্তি ঐ মাসআলায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি অথবা এমন ব্যাখ্যা, যেই ব্যখ্যা সে আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াতে অথবা

আল্লাহর রসূলের কোনো হাদীছে অথবা কোনো আছার যা আমলের অযোগ্য, আর উক্ত ব্যাখ্যাটিও ছহীহ হয়নি।

ফাসিদ ক্বিয়াস বা রায় হলো এমন বিশ্বাস যা সঠিক মনে করা হয় কিন্তু তা ভুল। সুতরাং ক্বিয়াস, রায় ও মানবীয় রুচিবোধ এই বিষয়গুলো সাধারণভাবে প্রায় সকল মুতাকাল্লিম (কালাম বা তর্ক শাস্ত্রবিদ) ও একদল ফক্বীহদের ভুলের কারণে হয়। অপরদিকে নছসমূহের তাবীল বা অপব্যাখ্যা সাধারণভাবে মুতাকাল্লিম, মুহাদ্দিস ও ফক্বীহদের ভুলের কারণে হয়।

ইবনুল ক্বাইয়্যীম ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন গ্রন্থে (৩/১০৮) বলেছেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কালাম সংরক্ষণ করা ওয়াজিব। সংকলকের কথার মধ্যেও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা ওয়াজিব। আর সাধারণভাবে সম্বোধনের সময় শব্দের বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য হয়, কথার মর্ম বোঝা ও বোঝানো কোনোটাই এই অর্থ ছাড়া পূর্ণ হয় না।

ইবনুল ক্বাইয়্যীম ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন গ্রন্থে (৪/১৪৮) বলেছেনঃ মুফতীর জন্য শ্রেয় হলো যতদূর সম্ভব হয় হুবহু নছ বর্ণিত শব্দের আলোকে ফাতাওয়া দেওয়া। কারণ, এটা বিধান ও দলীল উভয়টাকেই পূর্ণরূপে শামিল করে। এটা এমন বিধান, যেই বিধানে সঠিকতা বিদ্যমান থাকার পূর্ণ নিশ্চয়তা আছে, যেই বিধান সবচেয়ে সুন্দর ভাষায় দলীলকে ধারণ করেছে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো ফক্বীহ এর কথা এমন নয়, আর ছাহাবাগণ, তাবেঈন ও ঐ সকল ইমাম, যারা তাদের আদর্শ মোতাবেক পথে চলেছে, তারা এই বিষয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মনোনিবেশের প্রয়াস চালিয়েছেন। এরপরে এমন উত্তরসূরীরা এসেছে, যারা নুছূছ (কুরআন-সুন্নাহে ব্যবহৃত শব্দগুলো) হিফয করা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং নুছূছের কিছু বিকল্প শব্দ বানিয়ে নিয়েছে, যা তাদেরকে নুছূছ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। আর এটা জানা কথা যে, ঐ শব্দগুলো নুছূছের হিকমত, দলীল ও সুন্দর বর্ণনাকে পূর্ণরূপে ব্যক্ত করতে পারে না। নুছূছের শব্দগুলো পরিত্যাগ করা, নব উদ্ভাবিত শব্দগুলোকে পূর্ণমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া আর উম্মাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য বিধিসমূহকে সেই শব্দগুলোর সাথে সংযুক্ত করে দেওয়ার ফলে এমন অকল্যাণ দেখা দিয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

তাই নুছূছের শব্দগুলোই হলো সুরক্ষা ও নির্ভরযোগ্য সূত্র, যা ভুল ও পরস্পর বিরোধিতা থেকে, দুর্বোদ্ধ শব্দের ব্যবহার ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনা থেকে মুক্ত। আর যেহেতু এটা ছাহাবাগণের যুগের ও তাদের মৌলিক নীতিমালার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল, যেখানে তারা (যেকোনো মাসআলার জন্য)

প্রত্যাবর্তন করতেন। বিধায় তাদের জ্ঞান-বিদ্যা পরবর্তীদের জ্ঞানের চেয়ে অধিক ছ্বহীহ। আর তাদের ভুলের পরিমাণও পরবর্তীদের ভুলের তুলনায় কম। এরপরে তাবেঈন এর জ্ঞান সর্বাধিক ছ্বহীহ তাদের পরবর্তীদের জ্ঞানের তুলনায় এভাবে পরবর্তী উত্তরসূরীদেরও একই অবস্থা।

আল্লাহর রসূল – ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর ছাহাবাগণকে যখন কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো, তারা বলতেন: আল্লাহ এমন বলেছেন, আল্লাহর রসূল এমন বলেছেন, তারা কখনোই এই বিষয়ে দিশেহারা হতেন না এবং অন্যকোনো রাস্তাও তারা গ্রহণ করতেন না, যে তাদের উত্তরগুলো বিবেচনা করবে, সে তাদের উত্তরের মধ্যে অন্তরসমূহের আরোগ্য খুঁজে পাবে।

ইমাম শাওকানী ইরশাদুল ফুহূল গ্রন্থে (২৬৩ পৃষ্ঠা) বলেছেন: জেনে রাখো, শব্দের বাহ্যিক অর্থই হলো প্রকৃত দলীল। সেই দলীলের অনুসরণ করা ও সেই আলোকে আমল করা ওয়াজিব। বাহ্যিক শব্দসমূহের উপরে আমল করার ব্যাপারে ছাহাবাগণের ইজমা’ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মুন্তাহাল আরাব গ্রন্থে (২৩৫ পৃষ্ঠা) ইমাম শাওকানী আরো বলেছেন: যেসকল বিষয়ে ধারণা রাখা দরকার ও মনে রাখা দরকার, তার মধ্যে অন্যতম হলো “এই মহান শরী‘আত যা কিতাব ও সুন্নাহ এর মধ্যে বিদ্যমান বিধিসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন, আদেশ, নিষেধাজ্ঞা, উত্তম কাজের প্রতিদানমূলক অঙ্গিকার, অন্যায় কাজের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনমূলক সতর্কবাণী এবং যেসকল বিষয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে” এই বিষয়টি কোনো কিছু অস্পষ্ট না করে, কোনো ধাঁধাঁর মধ্যে নিজেকে না রেখে, বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে অন্যকোন অর্থ গ্রহণের উদ্দেশ্য এমন অবাস্তবিক পথে না যেয়ে সরাসরি জানা, যেই বিষয়ের উপর শাব্দিক গঠনও নির্দেশ করে, যা ‘আরবী ভাষাভাষীগণও বোঝে।

যে “কিতাব ও সুন্নাহর কোনো একটি হরফকে সেই হরফের প্রকৃত অর্থ ও স্পষ্ট অর্থের বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে” মর্মে বিশ্বাস করল, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি এমন ধারণা পোষণ করল, যা উভয়ের (আল্লাহ ও তাঁর রসূল) পক্ষ থেকে আমাদের নিকট আগত শব্দের (অর্থ) বিরোধী। আর যদি এটা কোনো একটি শারঈ স্বার্থের কারণে করা হয়, যার উপর শারঈ অথবা ‘আক্বলী (বাস্তবিক ও যৌক্তিক) সঠিকতা নির্ভরশীল, যেই সঠিকতার ব্যাপারে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি একমত, যা শুধুমাত্র মাযহাব ও দলীয় মতাদর্শের অনুসারীদের যৌক্তিক দাবি নয়, যা তাদের নিকট ভালো লাগে তাদের

একগুঁয়েমী মনোভাবের কারণে, যা তাদের বিবেকে জায়গা করে নিয়েছে তাদের ইনছাফ থেকে দুরে সরে থাকার কারণে, তাহলে বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে অন্যকোনো অর্থ গ্রহণে কোনো সমস্যা নেই। অন্যথায় বাহ্যিক অর্থ বাদ দেওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করা হবে।

সুতরাং এটাকেই আঁকড়ে ধরে রাখো। কারণ প্রকৃত অর্থই মূল। আর বিশেষ কোনো সম্পর্ক ও নির্দেশিকা ব্যতীত কোনোভাবেই প্রকৃত অর্থ থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যেমনটি মৌলিক শাস্ত্রসহ অন্যান্য শাস্ত্রগুলোতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তবে যে এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে ও তার চিন্তাকে কাজে লাগায়, বাহ্যিক অর্থসমূহের ধোঁকায় পতিত হয় না এবং উৎস ও উদ্ধৃতির বিশ্লেষণ না করে যেকোনো মতামত জড়বস্তুর ন্যায় শান্তভাবে মেনে নেয় না তার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তাফসীর, হাদীছ ও ফিক্বহ শাস্ত্রের গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান 'ইলম এই নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

অধিকাংশক্ষেত্রেই তুমি দেখবে, একপক্ষীয় মতাদর্শের অনুগামীরা তাদের মাযহাবের পক্ষ সমর্থন করে এবং তাদের মাযহাবকে কিতাব ও সুন্নাহ এর উপরে প্রাধান্য দেয়। তাই যখন তাদের সামনে এমন কোনো নছ্ব আসে, যা থেকে তারা নিজেদের আদর্শকে রক্ষা করতে পারে না, যেই নছ্বকে তারা প্রত্যাখ্যান করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রতিহত করতে অপারগ হয়েছে, তখন তারা দাবি করে যে, এটা মাজায (রূপক)। আর সংশ্লিষ্ট নছ্বকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে বের করে অন্য অর্থে স্থানান্তর করার লক্ষ্যে উভয় অর্থের মধ্যে একটি এমন বিশেষ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে, যা বাহ্যিক অর্থ থেকে অনেক দূরবর্তী। আর এমন নির্দেশিকার কথা উল্লেখ করে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যেই নির্দেশিকার কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না, যার কোনো প্রয়োজনও নেই। আর এই ধরনের অলীক কর্মকাণ্ডে তাদেরকে যে বিষয়টি সহযোগিতা করেছে, তা হলো তারা কৃত্রিমরূপে এতো অত্যধিক পরিমাণে ক্বরীনা (নির্দেশিকা) ও 'আলাক্বাহ এর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে যে, তারা "তাযাদ তথা বাহ্যিক অর্থটি মাজাযী অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবিশিষ্ট হওয়াকেও" মাজাযী অর্থে স্থানান্তর করার অন্যতম একটি 'আলাক্বা বা প্রকৃত সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। তাহলে তুমি লক্ষ্য করে দেখো, এটা কেমন খেলা, আর এই দরজাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করো, যেগুলো তারা কিতাব ও সুন্নাহ এর দলীলকে খণ্ডন করার লক্ষ্যে উন্মুক্ত করেছে। আর তাদের থেকে এগুলো তারাই গ্রহণ করেছে, যারা গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেনি এবং

দীর্ঘ গবেষণা করেনি, তাই তারা এটাকে একটি শাস্ত্রে রূপান্তরিত করে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহ এর উপরে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

আর এর মূল ভিত্তি হলো এমন দাবি, যেই দাবির পক্ষাবলম্বনে সে ভাষাবিদদের ব্যাপারে মিথ্যা রটিয়েছে, যে একপক্ষীয় মতাদর্শের অনুগামী হয়ে নিজের মাযহাবকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহ এর উপরে প্রাধান্য দিয়েছে। আর দলীলের উপর নিজের মাযহাবকে স্পষ্ট ভাষায় প্রাধান্য দিতে অপারগ হয়েছে। এরপরে সে আরো সূক্ষ্ম চিন্তা ও গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, যদিও এই দলীলের প্রকৃত অর্থ আমাদের মাযহাবের বিরুদ্ধে যায়, কিন্তু এই দলীলের মাজাযী অর্থ আমাদের মাযহাবের পক্ষে যায়। আর উভয় অর্থের মধ্যে সম্পর্ক হলো এই, আর লক্ষণ হলো এই, বাস্তবে কোনো সম্পর্ক বা লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। এই একপক্ষীয় মতাদর্শের অনুগামী ব্যক্তির পরের যুগে এমন গোঁড়া ব্যক্তি এই দায়িত্ব নিয়েছে যে মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি অনুসন্ধান করে না এবং মত ও পথ নিয়ে কোনো গবেষণাও করে না যেমনভাবে করা তার জন্য দরকার ছিল। যার ফলে সে পূর্বসূরী একপক্ষীয় মতের অনুগামীর নির্ণীত সম্পর্ককে বাহ্যিক অর্থ থেকে মাজাযী অর্থে স্থানান্তর করার প্রকৃত সম্পর্কসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়।

আর এই জন্যেই সম্পর্ককের সংখ্যা প্রায় ত্রিশটির কাছাকাছি। এরপরে যখন সমাজে প্রচলিত রীতি ও যৌক্তিক লক্ষণসমূহ সাধারণ লক্ষণগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো, তখন প্রত্যেক পক্ষপাতিত্বকারী বুদ্ধি ও প্রচলিত রীতির ব্যাপারে মিথ্যা রটিয়ে নিজের সিদ্ধি হাছিল করল এবং মতানৈক্যের ক্ষেত্রগুলোতে যা মনে চায় তাই করল, আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

শানক্বীত্বী আদ্বওয়াউল বায়ান গ্রন্থে (৭/৪৩৮) বলেছেনঃ এমন মহাসত্য, যেই সত্যের মধ্যে কোনো সংশয় নেই তা হলো ঐ মত, যেই মতের উপর আল্লাহর রসূল — ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — এর ছাহাবাগণ ও সকল সাধারণ মুসলিম প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা হলোঃ কোনো অবস্থাতেই কোনো পরিস্থিতিতেই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল — ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — এর সুন্নাহ এর বাহ্যিক অর্থ থেকে সরে যাওয়া জায়েয নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত অনিশ্চিত সম্ভাব্য ও অগ্রহণযোগ্য অর্থের দিকে স্থানান্তরকারী কোনো ছ্বহীহ শারঈ দলীল না পাওয়া যাবে।

আলবানী সিলসিলাহ আছ্ব-ছ্বহীহাহ গ্রন্থে (১/২৫৮) বলেছেনঃ আলেমগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নছের বাহ্যিক অর্থকে বাধ্য হয়ে পরিত্যাগ করেন, যার

কারণ হলো পরিত্যাগযোগ্য নছটি আরেকটি নছের স্পষ্ট অর্থের বিরোধী; আর দ্বিতীয় নছের অর্থ ও বাচনভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট ও অকাট্য। যেমন, কোনো নছের বুঝকে অন্য আরেকটি নছের এর কারণে পরিত্যাগ করা। 'আমকে খাছ্ব এর জন্য পরিত্যাগ করা, ইত্যাদি।

ক্বায়দা-৬: জমহূর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) আলেমের মতামতের ভিত্তিতে দলীলের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করা যাবে না।

জমহূর আলেমদের বক্তব্য প্রমাণযোগ্য দলীল নয়। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জমহূর আলেমদের মত এর অনুকরণ করে ইবাদত করার আদেশ দেননি। আর তাই জমহূর আলেম হাদীছের বাহ্যিক অর্থকে (রূপক অর্থে) রূপান্তরিত করেছেন এই কারণে হাদীছের বাহ্যিক অর্থকে রূপান্তর করা যাবে না। যেমন: জমহূর আলেমদের মতের অনুসরণ করে আমরের বাহ্যিক অর্থ ওয়াজিব থেকে মুস্তাহাব এর দিকে রূপান্তরিত করা যাবে না, নাহীর বাহ্যিক অর্থ হারাম থেকে মাকরূহ এর অর্থে রূপান্তরিত করা যাবে না, 'আমকে খাছের অর্থে রূপান্তরিত করা যাবে না। কারণ জমহূর আলেমদের বক্তব্য প্রমাণযোগ্য দলীল নয়। হাদীছের বাহ্যিক অর্থই প্রমাণযোগ্য দলীল। তাই প্রমাণযোগ্য দলীলকে প্রমাণের অযোগ্য দলীল দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

আল্লামা ছিদ্দীক্ব হাসান খান ক্বাওয়াঈদুত তাহদীস গ্রন্থে (৯১ পৃষ্ঠা) বলেছেন: উম্মাহর অধিকাংশের কর্মপদ্ধতি কোনো ছ্বহীহ হাদীছের বিপরীত হওয়াটা সেই হাদীছের জন্য কোনো সমস্যার কারণ হতে পারে না। কেননা অধিকাংশের বক্তব্য প্রমাণযোগ্য দলীল নয়।

ক্বায়দা-৭: শুধুমাত্র সম্ভাবনার কারণে দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মত বাত্বিল হয় না।

দলীল শুধুমাত্র সম্ভাবনার আবির্ভাবের কারণে বাত্বিল হয় না। আর আলেমদের বক্তব্য: "দলীলের বিপরীতে যখন কোনো সম্ভাবনার আবির্ভাব হয়, তখন সংশ্লিষ্ট দলীলটি বাত্বিল হয়ে যায়" এর উদ্দেশ্য হলো এমন শক্তিশালী দলীল, যার সঙ্গে শক্তিশালী নির্দেশিকা সংযুক্ত থাকে এবং সম্ভাবনাটি দালীলিক বিবেচনায় শক্তিশালী সাব্যস্ত হয়, কোনো সম্ভাবনার বিবেচনায় নয়।

কারণ, প্রতিটি দলীলের বিপরীতেই সম্ভাবনার উদয় হয়, এখন যদি সম্ভাবনার দরজা খুলে দেওয়া হয়, তাহলে কোনো দলীলই এমন থাকবে না যে, সেই দলীল দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়কে সম্ভাবনার আবির্ভাবের দাবির ভিত্তিতে বাত্বিল করে দেওয়া যাবে না। এরপরে সম্ভাবনার আবির্ভাবের ভিত্তিতে দলীল পেশ করার কার্যকারিতা বাত্বিল হওয়ার অর্থ হলো, অর্থাৎ ঐ উদ্দিষ্ট মর্মটি নির্দিষ্ট করার দিক থেকে ঐ উদ্দিষ্ট মর্মকে দলীল দ্বারা সাব্যস্ত করা, বিষয়টি এমন নয় যে, দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়টি সামগ্রিকভাবে ও বিস্তারিতভাবে বাত্বিল হয়ে যাবে।

বুখারী (ফাতহুল বারী ১/৪১৩), মুসলিম (১/১৪৫, হা/৫১২) আয়িশা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا.

"আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ললাম এর সম্মুখে আমার দুই পা তাঁর ক্বিবলার দিকে রেখে ঘুমিয়ে থাকতাম, যখন তিনি সেজদায় যেতেন, আমাকে ইশারা করতেন আর তখন আমি আমার উভয় পা গুটিয়ে নিতাম, আর যখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন, আমি আবার পা বিছিয়ে দিতাম"।

এই হাদীছের ভাষ্য হলো নারীকে স্পর্শ করার দ্বারা উযূ ভঙ্গ হয় না, তবে এই দলীলের ক্ষেত্রে এই অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে যে, এটা বিশেষ ঘটনা হওয়ারও সম্ভাবনা আছে অথবা স্পর্শটা কোনো অন্তরায় এর মাধ্যমে হয়েছিল।

আল্লামা আহমাদ শাকির সুনানুত তিরমিযীর তা'লীক্বে (১/১৪২) এই মতের সমালোচনা করে বলেছেন: এটা স্পষ্ট যে, এমন আপত্তির কোনো মূল্য নেই, বরং এটা সম্পূর্ণ বাত্বিল। কেননা বিশেষত্বের পক্ষে স্পষ্ট দলীল ছাড়া তা প্রমাণিত হয় না। আর কোনো অন্তরায় দ্বারা স্পষ্ট হয়েছিল এটা একমাত্র একরোখা ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ চিন্তা করতে পারে না।

ক্বায়দা-৮: সকল ক্বায়দা ও বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মুতাওয়াতির দলীল ও খবরে ওয়াহিদ দলীল এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

সকল ক্বায়দা ও শারঈ বিধিমালার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ হাদীছগুলো মুতাওয়াতির হাদীছের মতই। যেমনিভাবে মুতাওয়াতির মুতাওয়াতিরকে

রহিত করতে পারে, তেমনিভাবে খবরে ওয়াহিদও মুতাওয়াতিরকে রহিত করতে পারে। অপরদিকে যেমনিভাবে মুতাওয়াতির 'আমকে খাছ্ব করার ক্ষমতা রাখে, তেমনিভাবে খবরে ওয়াহিদও 'আমকে খাছ্ব করার ক্ষমতা রাখে। আবার মুতাওয়াতির যেমনিভাবে ক্বিয়াসের উপরে প্রাধ্যন্য লাভ করে, তেমনিভাবে খবরে ওয়াহিদও ক্বিয়াসের উপরে প্রাধান্য লাভ করে। আর এই নীতির আলোকেই সালাফে ছ্বলিহ আমল বিদ্যমান। কারণ তারা ক্বায়দা ও বিধিমালার কোনো ক্ষেত্রেই মুতাওয়াতির ও খবরে ওয়াহিদ এর মাঝে পার্থক্য করতেন না। বরং খবরে ওয়াহিদ ও মুতাওয়াতির এর মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা এমন একটি বিদ'আত, যা তাদের পরে উদ্ভাবিত হয়েছে।

যেহেতু ছাহাবাগণ কোনো বিধান রহিত করার ক্ষেত্রে একজন এর বক্তব্যকেও গ্রহণ করেছেন। এর দলীল হলো তারা একদা বায়তুল মুক্বাদ্দাস এর দিকে মুখ করে ছ্বলাত আদায় করছিলেন, এমন সময়ে তাদেরকে একজন ব্যক্তি সংবাদ দিলেন যে, ক্বিবলা কা'বার দিকে স্থানান্তর করে দেওয়া হয়েছে, তখন তারা ছ্বলাত আদায়কালীন কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন।

শাওকানী ইরশাদুল ফুহূল গ্রন্থে (২৩৬ নং পৃষ্ঠা) খবরে ওয়াহিদ মুতাওয়াতির এর ব্যাপকতা ('আম) কে নির্দিষ্ট (খাছ্ব) করতে পারে এই বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেন: ইবনুস সাম'আনী এই বিষয়টি বৈধ হওয়ার দলীল পেশ করেছেন ছাহাবাগণের ইজমা' এর দ্বারা। যেহেতু তারা আল্লাহর বাণী:

﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ﴾

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ নির্ধারণে তোমাদেরকে আদেশ করছেন" (আন-নিসা: ১১) এই আয়াতকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لانورث

"আমরা নবীদের সম্প্রদায় কাউকে (পার্থিব সম্পদ এর) ওয়ারিছ বানিয়ে যায় না" দ্বারা, তারা আল্লাহর এই বাণীর মর্মকেও নির্দিষ্ট করেছে:

﴿فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾

"তোমরা মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করো" (আত-তাওবা: ৫)

অগ্নিপূজকদের ব্যাপারে আব্দুর রহমান বিন ‘আউফ এর হাদীছ দ্বারা, এছাড়াও আরো অনেক দৃষ্টান্ত এমন আছে। এছাড়াও তাখছীছ্ব বা নির্দিষ্টকরণ বৈধ হওয়ার উপরে স্পষ্ট নির্দেশনা দান করে কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়াই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণের পক্ষে আল্লাহর ধার্য করা আদেশগুলো। তাই যখন তাঁর নিকট হতে কোনো দলীল আসবে, তখন তা মেনে নেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি সেই দলীলটির সঙ্গে ক্বুরআনের কোনো সাধারণ বিধান এর সংঘর্ষ হয়, তাহলে সমন্বয় সাধনের কর্মপদ্ধতি হবে আবশ্যকীয়ভাবে ‘আম এর ভিত্তি খাছ্ব এর উপরে স্থাপন করা। আর সাধারণ ব্যাপক বিধান তার অধীনস্ত সদস্যদের উপরে প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে তা যন্নী বা প্রবল ধারণার ‘ইলম বিশিষ্ট, অকাট্য ‘ইলম বিশিষ্ট নয়, বিধায় এমন ‘আম (সাধারণ বা ব্যাপক) বিধানকে ছ্বহীহ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা খাছ্ব করা নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কারণ নেই। তবে এমন ‘আম বিধানকে সাধারণভাবে নির্দিষ্ট করাকে নিষিদ্ধকারীরা দলীল পেশ করে থাকে “ফাত্বিমা বিনতু ক্বায়েস এর ঘটনায় উমার রদ্বীয়াল্লাহু আনহু এর ফয়ছ্বালা সম্পর্কিত” হাদীছ দ্বারা, যে তিনি তার জন্য বাসস্থান খোরপোষ এর ব্যবস্থা করেননি, যেমনটি তার থেকে বর্ণিত ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তখন উমার বললেন: কীভাবে আমরা আমাদের রব্ব এর বিধান একজন নারীর কথায় পরিত্যাগ করতে পারি? অর্থাৎ আল্লাহর বাণী:

﴿أَسۡكِنُوهُنَّ﴾

“তোমরা তাদের জন্য বাসস্থানে থাকার ব্যবস্থা করে দাও” [আত্ব ত্বালাক্ব: ৬]।

এই বিষয়ের উত্তর হলো, তিনি এমন কথা বলেছেন এই হাদীছের সঠিকতার ব্যাপারে তার সংশয়ের কারণে, কিতাব এর ব্যাপকতাকে খবরে ওয়াহিদ এর পর্যায়ের সুন্নাহ দ্বারা খাছ্ব করার বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করার স্বার্থে নয়, কেননা তিনি এটা বলেননি যে, কীভাবে আমরা আমাদের রব্ব এর কিতাবের ব্যাপকতাকে খবরে ওয়াহিদ এর দ্বারা নির্দিষ্ট করতে পারি। বরং তিনি বলেছেন: আমাদের রব্ব এর কিতাবকে কীভাবে আমরা একজন নারীর কথায় পরিত্যাগ করতে পারি? আর এ বিষয়টিকে ছ্বহীহ মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে: উমার বললেন: “আমরা আল্লাহর কিতাব ও আমাদের নাবীর সুন্নাহ কোনো নারীর কথায় পরিত্যাগ করতে পারি না, হতে পারে সে মুখস্ত রেখেছে অথবা ভুলে গেছে। সুতরাং এই বর্ণনা থেকে বোঝা গেল যে, উমার তার মুখস্ত রাখা ও ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ

করেছে, যদি তিনি নিশ্চিত হতেন যে, সে মুখস্ত রেখেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই বর্ণনা করেছে, তাহলে তিনি তার বর্ণনার উপরে আমল করতে দ্বিধা করতেন না।

শানক্বীত্বী তার গ্রন্থ মুযাককিরাহ ফী উছূলিল ফিক্বহে (৮৬ নং পৃষ্ঠা) বলেছেন: যারা বলেছেন খবরে ওয়াহিদ মুতাওয়াতিরকে রহিত করতে পারে না, তারা ভুল করেছেন।

ক্বায়দা-৯: দলীলের উপরেই আমল করা ওয়াজিব, যদিও জানা না যায় কেউ আমল করেছে কি না।

হাদীছ স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দলীল। হাদীছ দ্বারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেই হাদীছের উপরে কোনো ইমামের আমল থাকা জরূরী নয়। শাফেঈ আর-রিসালাহ গ্রন্থে (৪২২ নং পৃষ্ঠা) বলেছেন: আমাদেরকে সুফয়ান ও আব্দুল ওয়াহহাব ইয়াহয়া বিন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উমার ইবনুল খাত্ত্বাব বৃদ্ধাঙ্গুলির ক্বেছাছ নির্ধারণ করেছেন পনেরটি উট, পরবর্তী আঙ্গুলের জন্য দশটি উট, মধ্যমা আঙ্গুলের জন্য দশটি উট, কনিষ্ঠাঙ্গুলির পাশের আঙ্গুলের জন্য নয়টি আর কনিষ্ঠাঙ্গুলির জন্য ছয়টি। শাফেঈ বলেন: যেহেতু আমরা জানতাম — আল্লাহই ভালো জানেন — যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের ক্বেছাছে পাঁচটি উট ধার্য করেছেন, আর হাত পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন গঠন ও ভিন্ন ভিন্ন উপকারিতা বিশিষ্ট হয়ে থাকে, তাই তিনি হাত এর ক্বেছাছ নির্ধারণ করেছেন যথাযথভাবে, প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য হাতের তালুর সমপরিমাণ দীয়্যাত ধার্য করেছেন, এরপরে যখন আমরা আমর বিন হাযাম এর পরিবারের নিকটে প্রেরিত কিতাবখানা পেলাম, সেখানে লিখা ছিল: "প্রত্যেক আঙ্গুলের বিপরীতে দশটি উট মুক্তিপণস্বরূপ দিতে হবে", তখন আমরা সেই মতটি মেনে নিলাম।

হাদীছটিতে দুইটি নির্দেশনা আছে: প্রথমটি হলো: সংবাদ গ্রহণ করা। অপরটি হলো: যখন সংবাদ সাব্যস্ত হবে, তখন তা গ্রহণ করে নেওয়া, যদিও কোনো ইমাম ঐ সংবাদের উপরে আমল নাও করে থাকে। আর এই নির্দেশনাও আছে যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীছ স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হয়, অন্যের আমলের উপরে ভিত্তি করে নয়।

ইবনু হাযম আল-ইহকাম গ্রন্থে (৫/৬৬২) বলেছেন: যাকে কোনো নিশ্চিত নছ্ব অথবা ইজমা' কোনো মত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, আর সে এটা জানে না যে, তার পূর্বে কেউ এই মতের পক্ষে বলেছে কি না, তাহলে তার উপরে ঐ দলীলের পৌঁছে দেওয়া মতের পক্ষে বলা ফরয হয়ে যায়। আর যেই এই দলীলের বিরোধিতা করল, সে সত্যের বিরোধিতা করল। আর যে সত্যের বিরোধিতা করল, সে আল্লাহর বিরোধিতা করল। আল্লাহ তা'আলা এই ব্যাপারে এমন কোনো শর্ত যুক্ত করেননি যে, এই মতের প্রবক্তার পূর্বে এই মতের পক্ষে অন্য কোনো প্রবক্তা থাকতে হবে। বরং যারা এই মত পোষণ করেছে, তাদের মতকে তিনি অস্বীকার করেছেন। যেহেতু তিনি কাফেরদের বক্তব্যকে অস্বীকার করে বলেছেন, তারা বলে,

﴿مَا سَمِعۡنَا بِهَٰذَا فِي ٱلۡمِلَّةِ ٱلۡأٓخِرَةِ﴾

"আমরা এমন কথা পূর্বের ধর্মগুলোতে শুনিনি" [ছ্বদ: ৭]

আর যে এই মতকে অস্বীকার করল, সে সকল তাবেঈ ও তাদের পরবর্তী ফক্বীহদের বিরোধিতা করল। কারণ যেসকল আক্বীদাগত মাসআলায় ছাহাবাগণ ফতোয়া দিয়েছেন, সেগুলো সবই সীমিত ও সুসাব্যস্ত, বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ও হাদীছ শাস্ত্রের আলেমদের নিকট সুবিদিত, তাহলে যেই মত কোনো ছাহাবী থেকে আসেনি, বরং কোনো তাবেঈ বা তার পরবর্তী কোনো ব্যক্তি থেকে এসেছে, তা অবশ্যই ঐ মাসআলায় উক্ত তাবেঈর এমন বক্তব্য বা মত, যা তার পূর্বে নিঃসন্দেহে কেউ বলেনি। এমনিভাবে প্রতিটি এমন মাসআলা, যেই মাসআলায় কোনো ছাহাবী বা তাবেঈ থেকে কোনো মত আসেনি, বরং পরবর্তী ফক্বীহগণ সেই মাসআলায় মত দিয়েছেন, তাহলে এমন ক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে সেই ফক্বীহ উক্ত মাসআলায় এমন মত দিয়েছেন, যা তার পূর্বে আর কেউ দেয়নি।

ইবনুল ক্বাইয়্যীম ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন গ্রন্থে (৪/২০৪) বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তির নিকটে ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিম অথবা যেকোনো একটি অথবা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ সম্পর্কিত কোনো বিশ্বস্ত কিতাব বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার জন্য কি উক্ত কিতাব অনুসারে ফতোয়া দেওয়া বৈধ হবে?

এই ব্যাপারে পরবর্তী আলেমদের একদল বলেন: তার জন্য এমনটি করা বৈধ হবে না, যেহেতু অনেক হাদীছ রহিত হয়ে থাকতে পারে অথবা কোনো সাংঘর্ষিক হতে পারে অথবা কোনো হাদীছের বিপরীতমুখী অর্থও সে বুঝতে

পারে, বিধায় তার জন্য ঐ কিতাব অনুসারে আমল করা ও ফতোয়া দেওয়া কোনোটাই ছ্বহীহ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো ফিক্বহ ও ফতোয়া বিশেষজ্ঞ আলেমদের স্বরণাপন্ন না হবে।

আরেকদল আলেম বলেছেন: তার জন্য সেই কিতাব অনুসারে আমল করা ও ফতোয়া দেওয়াও বৈধ আছে। যেমন ছাহাবাগণ করতেন, যখন তাদের নিকটে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীছ এসে পৌঁছত এবং তারা সেই হাদীছটি একে অপরকে জানাতেন এবং কোনো প্রকার বিলম্ব বা সাংঘর্ষিক হাদীছ অনুসন্ধান না করেই সেই অনুসারে আমল করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। তাদের কেউ কখনো এই কথা বলতেন না, এই হাদীছের উপরে কি অমুক অমুক আমল করেছে? তারা যদি কাউকে এমন কথা বলতে দেখতেন, তাহলে তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। তাবেঈন এর অবস্থাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। আর এই বিষয়টি জরূরী ভিত্তিতে এমন সকলেরই জানা আছে, যাদের সামান্য পরিমাণও তাদের জীবন বৃত্তান্ত, মতামত ও তাদের সঙ্গে দীর্ঘ সংস্পর্শের অভিজ্ঞতা আছে।

আর কালের দূরবর্তীতা ও প্রাচীনতার কারণে কোনো মত পরিত্যাগ করা ও সেই মতের আলোকে আমল না করা আবশ্যক হয় না। আর যদি আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা ছ্বহীহ হওয়ার পরেও সেই অনুসারে আমল করা ছ্বহীহ না হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত অমুক অমুক সেই অনুসারে আমল না করে, তাহলে অমুক অমুক এর কথা সুন্নাহ এর মানদণ্ডে পরিণত হবে, সুন্নাহর পরিশোধক হয়ে যাবে, সুন্নাহ অনুসারে আমল করার ক্ষেত্রে শর্তে পরিণত হবে। অথচ এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের একটি বাত্বিল মত।

আর আল্লাহ স্বীয় রসূলের দ্বারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, উম্মাহর সদস্যদের দ্বারা নয়। আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সুন্নাহ প্রচারের আদেশ দিয়েছেন এবং যে তা পৌঁছে দেয় তার জন্য দু'আ করেছেন। তাহলে যার কাছে এই সুন্নাহ পৌঁছেছে, সে যদি অমুক ইমাম অমুক ইমাম আমল না করা পর্যন্ত সেই সুন্নাহ অনুসারে আমল না করে, তাহলে সেই সুন্নাহ প্রচারে কোনো উপকারিতা নেই। বরং অমুক অমুক এর মতের উপরেই আমলকে সীমিত করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায়।

ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন গ্রন্থে (৪/২১২) বলেছেন: এরপরে আমরা এমন এক যুগে এসে পৌঁছলাম, যখন কাউকে বলা হয়, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি এমন এমন বলেছেন।

তখন সে বলে: এই মত কে পোষণ করেছেন? এটা দ্বারা সে হাদীছের বক্ষে আঘাত করে অথবা এই মতের প্রবক্তা সম্পর্কে তার অজ্ঞতাকে উক্ত হাদীছের বিরুদ্ধে এবং সেই আলোকে আমল না করার পক্ষে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করে। যদি সে নিজের কল্যাণ কামনা করত, তাহলে সে বুঝতে পারত, এমন কথা চূড়ান্ত পর্যায়ের বাত্বিল কথা। আর এমন অজ্ঞতার দ্বারা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহকে প্রতিহত করা যায় না। এর চেয়েও নিকৃষ্ট হলো অজ্ঞ না হওয়ার ক্ষেত্রে তার অপারগতা। যখন সে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, উক্ত সুন্নাহ এর বিপরীতে ইজমা' সাব্যস্ত হয়েছে, যা মুসলিম জামা'আতের উপরে তার কুধারণা, যেহেতু সে তাদেরকে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ এর বিরুদ্ধে ঐমত্য পোষণ করার দিকে সম্বন্ধ করেছে। এর চেয়েও নিকৃষ্ট বিষয় হলো ইজমা' এর দাবির ব্যাপারে তার অজ্ঞতামূলক অক্ষমতা, যা হাদীছের পক্ষের মতাদর্শীর মত অনুসারে আমল না করা। সুতরাং মূল কথার ফলাফল দাঁড়াল সুন্নাহ এর উপরে তার মুর্খতা ও অজ্ঞতাকে প্রাদান্য দেওয়ার উপরে। আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী।

ইসলামের কোনো ইমাম সম্পর্কে এমন কথা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি বলেছেন: আমরা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীছের উপরে ততক্ষণ আমল করব না, যতক্ষণ উক্ত হাদীছের উপরে কেউ আমল করেছে বলে না জানব।

তিনি কিতাবুর রূহ (২৬৪ পৃষ্ঠা) গ্রন্থে বলেছেন: তুমি কোনো মতের প্রবক্তা সম্পর্কে তোমার অজ্ঞতাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে দলীলস্বরূপ ব্যবহার করো না। বরং নছ্ব এর দিকে অগ্রসর হও, দুর্বল হয়ে যেয়ো না। মনে রেখো অবশ্যই এই নছ্বের একজন প্রবক্তা আছে, কিন্তু তোমার কাছে তা পৌঁছেনি।

আলবানী সিলসিলা আছ্ব-ছ্বহীহা গ্রন্থে (১৬৩ পৃষ্ঠা) বলেছেন: কোনো ফক্বীহ সংশ্লিষ্ট হাদীছের পক্ষে মত দিয়েছেন কি না, সেই বিষয়ে না জানা সেই হাদীছের কোনো ত্রুটি নয় এবং সেই হাদীছ অনুসারে আমল করার পথেও অন্তরায় নয়। কেননা না পাওয়া না থাকা প্রমাণ পারে না।

ক্বায়দা-১০: দলীল অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব যদিও কোনো সালাফদের কেউ (আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হোন) সেই দলীলের বিরোধিতা করে থাকে।

দলীলের বিপক্ষে যায় এমন প্রত্যেকটি মতকেই সেই মতের প্রবক্তার দিকে নিক্ষেপ করতে হবে। চাই তিনি যেই হোক, এমনকি তিনি যদি খুলাফায়ে রাশিদীন এর অন্তর্ভুক্তও হয়ে থাকেন। আর যারা 'ইলমের দিক থেকে তাদের চেয়ে নিম্নস্তরে তারা তো অনেক দূরে। কারণ আমাদেরকে আল্লাহ সুন্নাহ এর অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন।

ইবনুল ক্বাইয়্যীম আছ্ ছ্বওয়াঈক্বুল মুরসালাহ গ্রন্থে (৩/১০৬৩) বলেছেন: আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস তামাত্তু হজ্জের মাসআলায় আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ দ্বারা দলীল পেশ করেছেন এবং স্বীয় সঙ্গীদেরকে ঐ হজ্জ পালনের আদেশ দিলেন। তখন তারা বলল: আবূ বকর ও উমার (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ইফরাদ হজ্জ করেছেন, তামাত্তু হজ্জ করেননি। পরে যখন তারা এই বিষয়টি নিয়ে বেশি করে বলাবলি করতে লাগল, তিনি বললেন: আমার ভয় হয়, তোমাদের উপরে কখনো আসমান থেকে পাথর বর্ষণ হয়। আমি তোমাদেরকে বলছি: আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আর তোমরা বলছ: আবূ বকর ও উমার বলেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা পালন করার অনুমতি দিলেন। তখন তাকে বলা হলো: আপনার পিতা এই হজ্জ করতে নিষেধ করেছেন। তখন তিনি বললেন, আমার পিতার বক্তব্য তোমরা যেমনটি মনে করছ, তেমন না। এরপরেও যখন তারা এই কথা বেশি করে বলতে লাগল। তিনি বললেন: আল্লাহর রসূলের বক্তব্য তোমাদের জন্য অনুকরণের অধিক যোগ্য নাকি উমারের বক্তব্য?

তিনি ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন গ্রন্থে (১/২৩) বলেছেন: যখনই তিনি (অর্থাৎ ইমাম আহমাদ) কোনো নছ্ব দেখতেন, সেই নছ্বের আলোকে ফতোয়া দিতেন, এই মতের বিপরীত মত কোনটি এবং কে এই মতের বিরোধিতা করেছেন, তা তিনি দেখতেন না। সে যেই হোক না কেন। এই জন্যেই তিনি বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া স্ত্রীর ব্যাপারে ফাত্বিমা বিনতু ক্বায়েসের হাদীছের কারণে উমারের মতানৈক্যের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি, জুনুবী (যার উপরে গোসল ফরয হয়েছে) ব্যক্তির তায়াম্মুম আবশ্যক হওয়ার মাসআলায় আম্মার বিন ইয়াসিরের হাদীছের কারণে উমারের মতানৈক্যের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি। মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম বাধার পূর্বেই ব্যবহার করেছেন এমন সুগন্ধি ব্যবহার

অব্যাহত রাখার মাসআলায় আয়িশার হাদীছ ছ্বহীহ হওয়ার কারণে উমারের মতানৈক্যের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি, মুসলিমকে কাফেরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানানোর ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে উত্তরসূরী হওয়াকে নিষিদ্ধকারী হাদীছ এর কারণে মু'আয ও মু'আবীয়ার বক্তব্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি, আবার মুদ্রার বিনিময় এর ব্যবসায় ইবনু আব্বাসের বক্তব্যের দিকেও ভ্রুক্ষেপ করেননি, তার মতের বিপরীত হাদীছ ছ্বহীহ হওয়ার কারণে এবং এমনিভাবে গাধার গোশত বৈধ হওয়ার পক্ষেও তার মতের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি। এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

ক্বায়দা-১১: দলীল পরিত্যাগ করা বৈধ নয় যদিও মানুষ সেই দলীলের বিপরীত আমল করে।

ইবনুল ক্বাইয়্যীম ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন গ্রন্থে (২/৩৯৫) বলেছেন: যদি সুন্নাহ মানুষের আমলের দিকে তাকিয়ে পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ অকার্যকর হয়ে পড়বে। সুন্নাহ এর রীতিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সুন্নাহ এর নিদর্শনগুলো মুছে যাবে। কত আমল আছে, যেগুলো যুগের পরিবর্তনে স্পষ্ট সুন্নাহ এর বিপরীতে প্রচলিত হয়ে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান। প্রতিটি মূহুর্তেই একেকটি সুন্নাহ পরিত্যাগ করে তার বিপরীত আমল চর্চা করা হচ্ছে। যেই নীতির উপর আমল ধারাবাহিকতা লাভ করছে, তুমি সামান্য পরিমাণ এমন কিছু সুন্নাহ পাবে, যেগুলোর উপরে অবহেলা করে আমল করা হয়। তুমি অবহেলাকৃত ও যেগুলো সামষ্টিক বিচাবে কার্যকরী করা হয় না, এমন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো। সে যদি সেই অনুসারে আমল করে, তাহলে মানুষ বলবে, সুন্নাহটি পরিত্যাগ করা হয়েছে। ছ্বহীহ সুন্নাহ এর বিপরীতে যত আমল আছে, কোনোটিই বর্ণনাভিত্তিক নয়, বরং এগুলো সবই ইজতেহাদী। আর ইজতেহাদ যখনই সুন্নাহ এর বিপরীতে যাবে, তখনই তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

ইবনু হাযম আল-মুহাল্লা গ্রন্থে (৫/৬৬১) বলেছেন: শায হলো সত্যের বিরোধিতা করা। তাই যে ব্যক্তি কোনো মাসআলায় সত্যের বিরোধীতা করল, সে উক্ত মাসআলায় শায। চাই তারা পুরো পৃথিবীবাসী হোক অথবা পৃথিবীবাসীর আংশিকই হোক। আর জামা'আত ও সঠিক দল হলো যারা হক্বের অনুসারী, যদিও তাদের সংখ্যা পৃথিবীতে একজনই হোক না কেন, সেই একটি জামা'আত, সেই একটি দল। আবূ বকর আর খাদীজা ﷺ যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন তারা দুইজনেই একটি জামা'আত ছিলেন,

আর তারা উভয়ে ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর সকলেই শায ও বিচ্ছিন্ন মতের অনুসারী ছিল।

ক্বায়দা-১২: দলীল কখনো বিবেক-বুদ্ধির সাংঘর্ষিক হয় না। বরং বিবেক-বুদ্ধি দলীলের উপর কোনো অভিযোগ না করেই দলীলকে স্বীকার করবে।

আলী বিন আবূ ত্বালিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

"যদি দীন যুক্তি মেনে চলত, তাহলে মোজার উপরের অংশের চেয়ে নিম্নের অংশ মাসাহ করাটাই অধিক উত্তম হতো। অথচ আমি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দুই মোজার উপরের অংশে মাসাহ করতে দেখেছি"। হাদীছটি আবূ দাউদ (১৬২ নং হাদীছে) বর্ণনা করেছেন। এটা ছহীহ হাদীছ।

ছাম'আনী ছাওনুল মানত্বিক্ব গ্রন্থে (১৬৬ নং পৃষ্ঠা) বলেছেন: আহলুল হক্ব বা হক্বের অনুসারীগণ কিতাব ও সুন্নাহকে তাদের মানদণ্ড বানিয়েছেন। দীনকে তারা সেখান থেকেই অনুসন্ধান করে। তাদের বিবেক ও আবেগ থেকে যা উৎসারিত হয়েছে, সেগুলোকে তারা কিতাব ও সুন্নাহ এর কষ্টিপাথরে যাচাই করে। যদি সেই সিদ্ধান্তকে তারা উভয়টির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে নিশ্চিত হয়, তখন তারা সেই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে এবং মহান আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, যেহেতু তিনিই তাদেরকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি দান করেছেন এবং সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক্ব দিয়েছেন। আর যদি তারা সেই সিদ্ধান্তকে উভয়টির বিপরীত দেখে, তাহলে তারা নিজেদের সিদ্ধান্তকে পরিহার করে এবং ক্বুরআন-সুন্নাহর দিকে অগ্রসর হন, নিজেদের ভুল ধারণা দূর করেন। কারণ ক্বুরআন-সুন্নাহ একমাত্র সত্যের দিশারী। আর মানুষের মত কখনো সত্য হতে পারে আবার কখনো মিথ্যা হতে পারে।

তিনি (১৭৫ নং পৃষ্ঠা) আরো বলেছেন: আর আহলুস সুন্নাহ — আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন — সর্বদা কিতাব ও সুন্নাহ এর স্পষ্ট বক্তব্যকেই গ্রহণ করে। সেই মতের পক্ষে তারা স্পষ্ট প্রমাণাদি ও ছহীহ দলীল উপস্থাপন করে, যেভাবে শরী'আত তাদেরকে অনুমতি দিয়েছে। যেভাবে বর্ণনা এসেছে, তারা আল্লাহর ছিফাতসমূহে এবং দীনের অন্যান্য

বিষয়াবলিতে নিজেদের মতকে সংযোজিত করে না, আর এই পথের উপরেই তারা তাদের সালাফগণকে পেয়েছে।

শানক্বীত্বী মুযাক্কিরাতু উছূলিল ফিক্বহ গ্রন্থে (১২৫ নং পৃষ্ঠা) বলেছেন: মুসলিম ব্যক্তির উপরে ওয়াজিব হলো নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ছহীহ সনদে সাব্যস্ত হয়েছে এমন প্রতিটি বিষয়কে গ্রহণ করা। এই কথা তাকে জেনে নিতে হবে যে, যদি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত বিষয়ের অনুকরণ করেও হেদায়েত ও মুক্তি তার অর্জিত না হয়, তবে সেই মুক্তি আর হেদায়েত তার মুর্খতা ও দুশ্চিন্তার সাগরে দিশেহারা বিবেক এর বিচারের আলোকে কখনো অর্জিত হবে না।

ক্বায়দা-১৩: যেই বিধানগুলো দলীলের মধ্যে সাধারণভাবে কোনো শর্ত ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে সেই বিধানগুলোকে সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

শায়খুল ইসলাম মাজমূ' ফাতাওয়া গ্রন্থে (১৯/২৩৬) বলেছেন: বিধায় আল্লাহ যেসকল বস্তুর নাম সাধারণভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেই বস্তুগুলোর সঙ্গে আদেশ, নিষেধ ও হালাল, হারামসহ যেই বিধিমালা সংযুক্ত করেছেন, সেই বিধিগুলোর ব্যাপারে কারোর এই অধিকার নেই যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা ছাড়াই সেগুলোকে সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো পানির নাম ক্বুরআন ও সুন্নাহে সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে পবিত্র ও অপবিত্র এভাবে দুই ভাগে ভাগ করেননি, বিধায় এমন বিভক্তিকরণ ক্বুরআন সুন্নাহ এর বিপরীত। এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো হায়েয এর নাম, যেই নামের সঙ্গে আল্লাহ অনেকগুলো বিধি ক্বুরআন ও সুন্নাহে সংযুক্ত করেছেন, কিন্তু এর কোনো সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করে দেননি, এবং দুই হায়েযের মধ্যবর্তী কোনো পবিত্রতার সময়কাল এর কথাও বর্ণনা করেননি যদিও উম্মত এই বিষয়ে ব্যাপকভাবে দুর্যোগের শিকার হয়ে থাকে এবং এই বিষয়টি উল্লেখ করা তাদের চাহিদার দাবি ছিল।

এরপরে (২৪৩ পৃষ্ঠা) তিনি বলেছেন: আল্লাহ ও তাঁর রসূল ক্বছর ও ছিয়াম না রাখা সফরের সাথে সংযুক্ত করেছেন এবং এই সফরকে কোনো দুরত্বের সঙ্গে সীমাবদ্ধ করে দেননি। আর দীর্ঘ আর অল্প দূরত্বের মাঝে কোনো তফাৎ নেই। যদি সফরের কোনো নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকত, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন। অভিধানেও এর কোনো দূরত্বের কথা উল্লেখ নেই। তাই ভাষাবিদগণ যেটাকে সফর বলবেন, সেটাই সফর